শুক্তি

২০২৪-২০২৫

পণ্ডিত লক্ষীকান্ত মৈত্র

শান্তিপুর কলেজ

শান্তিপুর, নদীয়া

শান্তিপুর কলেজ পরিচালন সমিতির সভাপতির কলমে

২০২৪-২০২৫ শিক্ষাবর্ষের শান্তিপুর মহাবিদ্যালয়ের বার্ষিক পত্রিকা ‘‘শুক্তি’’ প্রকাশিত হতে চলেছে। প্রতিবারেই এই পত্রিকা মধ্যে দিয়ে ছাত্রছাত্রীদের সাহিত্যচেতনা ও চিন্তার স্ফূরণ ঘটে। হয়তো এই ক্ষুদ্র পত্রিকার মাধ্যমেই ভবিষ্যতের মহীরূপ রোপিত হবে, প্রতিভা বিকশিত হবে। বলা বাহুল্য, পত্রিকায় সবার লেখা প্রকাশ করা সম্ভব হয় না। যারা সুযোগ পেলো না তাদেরও বলব হতাশ না হতে। ভবিষ্যতে হয়তো তাদেরও সুযোগ আসবে। পত্রিকার সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করে পত্রিকা প্রকাশে যাদের ভূমিকা ও অবদান অনস্বীকার্য তাদের সকলকে সাধুবাদ জানাই। শুভমস্তু!

ড. ব্রজকিশোর গোস্বামী
শান্তিপুর কলেজ পরিচালন সমিতির সভাপতি
১২ই মার্চ ২০২৬

শান্তিপুর কলেজ পরিচালন সমিতি

১.	ড. ব্রজকিশোর গোস্বামী	(সভাপতি)
২.	ড: সঞ্জীব কুমার পাকিরা	(অধ্যক্ষ ও সম্পাদক)
৩.	শ্রী রতনেশ মিশ্র	(সরকারী প্রতিনিধি)
৪.	শ্রী প্রণব কুমার ঘোষ	(সরকারী প্রতিনিধি)
৫.	ড. শুভাশিষ মুখার্জী	(বিদ্যালয় প্রতিনিধি)
৬.	ড. বৈজয়ন্তী ঘোষ	(বিদ্যালয় প্রতিনিধি)
৭.	ড. শুচিস্মিতা সান্যাল	(শিক্ষক প্রতিনিধি)
৮.	ড. গোপা ভট্টাচার্য	(শিক্ষক প্রতিনিধি)
৯.	শ্রী কিংকর মণ্ডল	(শিক্ষক প্রতিনিধি)
১০.	শ্রী উপেন কুমার রায়	(শিক্ষাকর্মী প্রতিনিধি)
১১.	শ্রী দেবাশীষ প্রমাণিক	(অনুদানকারী সদস্য)

অধ্যক্ষ মহাশয়ের কলমে

সারস্বত সাধনার প্রাচীনতম প্রাণকেন্দ্র শান্তিপুর কলেজের ঐতিহ্যমণ্ডিত গৌরবান্বিত বার্ষিক পত্রিকা ''শুক্তি'' নবরূপে প্রকাশিত হতে চলেছে। শুক্তির মুক্তোর মতো ছাত্র-ছাত্রীদের সুপ্ত প্রতিভার শৈল্পিক নান্দনিক প্রকাশে সমৃদ্ধ হোক ''শুক্তি''। এই সৃষ্টি সুখের উল্লাসে বর্তমানের সৃষ্টির অঙ্কুর আগামীতে বনস্পতিতে পরিণত হবে—এই প্রত্যয় রাখি। সম্পাদকমণ্ডলী, অধ্যাপক, অধ্যাপিকামণ্ডলী এবং ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দের আন্তরিক প্রচেষ্টায় পত্রিকা প্রকাশিত হতে চলেছে, এতদুপলক্ষে সকলকে জানাই হার্দিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। ''শুক্তি''র সফল প্রকাশ আমাদের মহাবিদ্যালয়ের সুস্থ সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলকে পরিপুষ্ট করবে—এই শুভ কামনা করি।

ড: সঞ্জীব কুমার পাকিরা

অধ্যক্ষ

শান্তিপুর কলেজ

১২ই মার্চ, ২০২৬

কলেজ অধ্যাপক-অধ্যপিকা ও শিক্ষাকর্মী বৃন্দ

অধ্যক্ষ: ড. সঞ্জীব কুমার পাকিরা, এম.কম., এম.ফিল., পি.এইচ.ডি.

(ক) বিজ্ঞান বিভাগ ঃ

পদার্থবিদ্যা বিভাগ ঃ ড: জ্যোর্তিময় গুহ, এম.এস.সি., পি.এইচ.ডি.;
ড: আত্রেয়ী পাল, এম.এস.সি., পি.এইচ.ডি.;
ড: দীপঙ্কর ভট্টাচার্য, এম.এস.সি., পি.এইচ.ডি.;
ড: অনিতা গঙ্গোপাধ্যায়, এম.এস.সি.;
ড: পলাশ দাস, এম.এস.সি., পি.এইচ.ডি.;
শ্রী চিন্তাহরণ মজুমদার, এম.এস.সি., বি.এড.;
ড: দিব্যেন্দু বিশ্বাস, এম.এস.সি., পি.এইচ.ডি.
শ্রী শুভায়ু চৌধুরী, এম.এস.সি.;

রসায়ণ বিভাগ ঃ ড: সঞ্জয় ধাড়া, এম.এস.সি., বি.এড., পি.এইচ.ডি.;
ড: সুদীপ কুমার চট্টোপাধ্যায়, এম.এস.সি., পি.এইচ.ডি.;
ড: নম্রতা রায়, এম.এস.সি., পি.এইচ.ডি.;
ড: প্রসেনজিৎ মণ্ডল, এম.এস.সি., পি.এইচ.ডি.;
শ্রীমতী ইন্দ্রাণী রায়, এম.এস.সি., বি.এড. (স্যাক্ট)

উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগ ঃ মিস সপ্না তামাং, এম.এস.সি.;
শ্রীমতী সংহতি কুণ্ডু, এম.এস.সি., বি.এড. (স্যাক্ট)
শ্রীমতী সুলগ্না রায়, এম.এস.সি. (স্যাক্ট)
শ্রী রাজকুমার শর্মা, এম.এস.সি., বি.এড. (স্যাক্ট)

প্রাণীবিদ্যা বিভাগ ঃ ড: সহেলী আলি, এম.এস.সি., পি.এইচ.ডি.
শ্রীমতী অদ্রীজা বিশ্বাস, এম.এস.সি., (আংশিক)
শ্রী প্রণয় মুখার্জী, এম.এস.সি., (আংশিক)
শ্রীমতী পলাশপ্রিয়া ঘোষ, এম.এস.সি., (আংশিক)

গণিত বিভাগ ঃ শ্রী অসীম কুমার বিশ্বাস, এম.এস.সি. (অবসর জন, ২০২৫)
ড: মহঃ মামুন আর. রসিদ, এম.এস.সি., পি.এইচ.ডি.;
ড. ইন্দ্রণী রায়, এম.এস.সি., পি.এইচ.ডি.;
ড. রিতপা চক্রবর্তী, এম.এস.সি.;
শ্রী সুমন ঘোষ, এম.এস.সি., বি-এড;
শ্রী সুমন প্রামাণিক, এম.এস.সি., (আংশিক)

কম্পিউটার বিভাগ ঃ শ্রীমতী মিত্রা দে, এম.সি.এ. (স্যাক্ট);
(মেজর) শ্রীমতী জয়িতা দাস, পি.জি.ডি.এম. (স্যাক্ট);
শ্রী শুভ রঞ্জন দাস, এম.সি.এ. (স্যাক্ট)।

অর্থনীতি বিভাগ ঃ ড: প্রসেনজিত দাস, এম.এস.সি., পি.এইচ.ডি.।

(খ) বাণিজ্য বিভাগ ঃ

১. ড. নব্যেন্দু বসাক, এম.কম., পি.এইচ.ডি.
২. শ্রী চন্দন নস্কর, এম.কম.

(গ) কলা বিভাগ

বাংলা বিভাগ ঃ ড: শুচিস্মিতা সান্যাল, এম.এ., পি.এইচ.ডি.;
ড: সমাধান শিকারী, এম.এ., পি.এইচ.ডি.;
ড: মহঃ মিসবাউল ইসলাম, এম.এ., পি.এইচ.ডি.;
ড: অমল চন্দ্র সরকার, এম.এ., পি.এইচ.ডি.;
শ্রী প্রীতম কুমার দাস, এম.এ, বি.এড (স্যাক্ট);
শ্রীমতী অর্পিতা চক্রবর্তী, এম.এ., বি.এড. (স্যাক্ট);
ড. অসীম সরকার, এম.এ., পি.এইচ.ডি (স্যাক্ট)।

ইংরাজী বিভাগ ঃ ড: অনিবার্ণ ভট্টাচার্য, এম.এ., পি.এইচ.ডি.;
ড: অমৃতা চক্রবর্তী, এম.এ., এম. ফিল., পি.এইচ.ডি.;
শ্রী সঞ্জয় দেবনাথ, এম.এ. (ডবল) (স্যাক্ট);
শ্রী অয়ন কুমার খাঁ, এম.এ. (ডবল) (স্যাক্ট);
শ্রীমতী সুমনা ঘোষ, এম.এ., বি-এড;
শ্রী শুভঙ্কর ঘোষ, এম.এ., বি-এড (স্যাক্ট) (জানুয়ারী, ২০২৫)

ইতিহাস বিভাগ ঃ ড: বিমান সমাদ্দার, এম.এ., পি.এইচ.ডি. (জেনারেল ট্রান্সফার, ডিসেম্বর, ২০২৫);
ড: সুব্রত রায়, এম.এ., পি.এইচ.ডি.;
শ্রী অলোক বিশ্বাস, এম.এ.;
সুদীপ্ত সাধুখাঁ, এম.এ., পি.এইচ.ডি.;
শ্রী রামকৃষ্ণ মণ্ডল, এম.এ. (স্যাক্ট)।

দর্শন বিভাগ ঃ ড: গোপা ভট্টাচার্য, এম.এ., এম. ফিল., পি.এইচ.ডি.;
শ্রী চিরঞ্জিত রায়, এম.এ. এম.ফিল., বি.এড.;
শ্রীমতি সুস্নিগ্ধা নাথ, এম.এ., এম.ফিল. (স্যাক্ট)।

সংস্কৃত বিভাগ ঃ ড: শ্রীবাস দেবনাথ, এম.এ., এম.ফিল., পি.এইচ.ডি.;
ড: সুজাতা সরকার, এম.এ., পি.এইচ.ডি.;
শ্রীমতি মিনাক্ষী প্রামাণিক, এম.এ.;
ড: বন্দনা কুণ্ডু, এম.এ., পি.এইচ.ডি. (অবসর মার্চ, ২০২৪)

শারীর শিক্ষা বিভাগ ঃ শ্রীবাস দাস, বি.এ., বি.পি.এড., এম.পি.এড (স্যাক্ট);
সাবির আলি সেখ, বি.এ., বি.পি.এড., ডি.পি.টি., এম.পি.এড ।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ ঃ শ্রী কিংকর মণ্ডল, এম.এ.;
শ্রী কালীপদ সাহা, এম.এ. বি.এড. (স্যাক্ট);
ড: সুশান্ত সরকার, এম.এ., পি.এইচ.ডি. (স্যাক্ট);
শ্রীমতী স্বাতী চক্রবর্তী, এম.এ. (স্যাক্ট)।

(ঘ) লাইব্রেরিয়ান ঃ

১. রুমকি প্রামাণিক, এম.এ., এম.এল.আই.এস

অফিস শিক্ষাকর্মী

১. শ্রী প্রদ্যোৎ কুমার দাস - এইচ.এস.
২. শ্রী অজয় কুমার ঘোষ - বি.এস.সি
৩. শ্রী অমিত কুমার বিশ্বাস - এইচ.এস.
৪. শ্রী উপেন্দ্র কুমার রায় - মাধ্যমিক
৫. শ্রী উজ্জ্বল নন্দী (আংশিক) - এইচ.এস.
৬. শ্রী সুবীর মুখার্জী (আংশিক) - মাধ্যমিক , বিহাই অল ইন্ডিয়া রেডিও প্রেসার ভারতী
৭. শ্রী রবিন রায় (আংশিক) - এইট
৮. শ্রী বিশ্বজিৎ রায় (আংশিক) - এম.এ.
৯. শ্রী অরিন্দম রায় (আংশিক) - এইচ.এস.
১০. শ্রী তপন কুমার ঘোষ (আংশিক) - মাধ্যমিক
১১. শ্রী সুধীর কুমার ঘোষ (আংশিক) - মাধ্যমিক
১২. শ্রীমতী মিতালি পাল (আংশিক) - মাধ্যমিক
১৩. শ্রী শঙ্কর প্রসাদ সরকার (আংশিক) - বি.এ., বি.কম., এম.এল.আই.এস
১৪. শ্রীমতী পৃথা প্রমানিক (আংশিক) - এম.এস.সি., এম.এ., বি.এড.
১৫. শ্রী পলসন ঘোষ (আংশিক) - এম. এ., এল.এল.বি

১৬. শ্রী জয়দীপ কুণ্ডু (আংশিক) - এম.এ.
১৭. শ্রী অর্নিবান বিশ্বাস (আংশিক) - এম.সি.এ., ডিপ্লমা ইন মাল্টিমিডিয়া
১৮. শ্রী সুশান্ত কর্মকার (আংশিক) - ডিপ্লমা ইন ইলেকট্রিক ইঞ্জিনিয়ার
১৯. শ্রী রাজেন ডোম (আংশিক) - ক্লাস ফোর
২০. শ্রীমতী শ্যামলী আশু (আংশিক) - ক্লাস এইট
২১. মহঃ নাসির আলি শেখ (আংশিক) বাগান পরিচর্যাকারী
২২. সাবির আলি শেখ (আংশিক) - বি.এ., বি.পি.এড., ডি.পি.টি., এম.পি.এড
২৩. শ্রী দীপক ঘোষ (আংশিক) - বি.কম.
২৪. শ্রীমতী সুদেষ্ণা সাহা (আংশিক) - বি.এস.সি, ডি.এ.এল.এ.ডি
২৫. শ্রীমতী সুমনা ঘোষ (আংশিক) - বি.এ., ডি.এ.এল.এ.ডি
২৬. মহঃ ফিরোজ আলি শেখ (আংশিক) - বি.এ (ডেইলি বেসিক)
২৭. শ্রী সঞ্জয় দাস (অতিথি) - রিটায়ার্ড, জানুয়ারী, ২০২৬
২৮. শ্রী অশোক বিশ্বাস (অতিথি) - রিটায়ার্ড, জানুয়ারী, ২০২৬
২৯. শ্রী অজয় প্রামাণিক (অতিথি) - রিটায়ার্ড, জানুয়ারী, ২০২৬

ম্যাগজিন কমিটির ২০২৪-২৫ এর সদস্য বৃন্দ

১. শ্রী প্রীতম কুমার দাস (আহ্বায়ক)
২. শ্রী অলক বিশ্বাস
৩. ড. সমাধান শিকারী
৪. শ্রী কিংকর মণ্ডল
৫. ড. অনির্বাণ ভট্টাচার্য
৬. ড. সুদীপ্ত সাধুখাঁ
৭. ড. নম্রতা রায়
৮. ড. অমৃতা চক্রবর্তী
৯. শ্রী রামকৃষ্ণ মণ্ডল
১০. শ্রী অয়ন কুমার খাঁ
১১. শ্রী শুভ রঞ্জন দাস

প্রশান্তি

কলমে: কৌস্তভ নন্দী (বাংলা বিভাগ)

মৃন্ময় বাবু পেশায় একজন চাকুরীজীবী। স্ত্রী ও একমাত্র ছেলেকে নিয়ে তার সংসার। তিনি নিজের স্বচ্ছন্দ জীবনযাপন করতে ভালোবাসেন। তাই তিনি রোজ যেমন সকালে অফিস যান এবং ঠিক তেমনই সন্ধ্যাবেলা অফিস থেকে ফিরে কখনো পাড়ার ক্লাবে কিংবা চায়ের দোকানে বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দেন অথবা সমাজে ঘটে চলা নানা ঘটনা সম্পর্কে তর্ক-বিতর্ক করেন। ঠিক সেরকমই একদিন সন্ধ্যাবেলায় তিনি চায়ের দোকানে বন্ধুদের সঙ্গে বসে খবরের কাগজে পড়ছিলেন তবে কিছুক্ষণ খবরের কাগজ পড়ার পর তিনি এক দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন "হুর! এইরকম করে কি আর বাঁচা যায়!" তার কথা শুনে আর যারা ছিল তারা বলে উঠলো কি হলো মৃন্ময় দা? মৃন্ময় বাবু বললেন কদিন ধরে একটা জিনিসের খোঁজ করছি তবে কোনমতেই তা খুঁজে পাচ্ছিনা। তখন সবাই কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করলো "কি সেই জিনিস?" মৃন্ময়বাবু গম্ভীর কণ্ঠে বললেন সেটা হলো প্রশাস্ত্রি জায়গা বুঝলেন। যেখানে আমি একটু শান্তি অনুভব করতে পারি কারণ এই রোজ রোজ একঘেঁয়ে জীবন যেন অসহনীয় হয়ে উঠেছে। আর মৃন্ময় বাবুর এইরকম মনে হওয়ার কারণ সবাই বুঝতেও পারলো আর তাই সেই মুহূর্তে সবাই যেন কেমন নীরব হয়ে উঠলো। তবে তাদের মধ্যে উপস্থিত থাকা একজন সেই নীরবতা ভাঙলেন আর বলে উঠলেন তাহলে কদিনের জন্য একটু হওয়া বদল করে আসুন। এই কথা শুনে মৃন্ময় বাবু বললেন এই তো গতমাসে দুই দিনের জন্য পরিবারের সাথে পুরী বেড়াতে গিয়েছিলাম কিন্তু সেখানে কি আর একটু শান্তি করে সময় কাটাবো তার উপায় আছে কি! সর্বত্র মানুষের সমাগম সেটা পূজার মন্দিরে হোক কিংবা সমুদ্রের ধারে। তখন তার আরেক বন্ধু বলে উঠলেন তাহলে একদিন পাহাড়ে ঘুরে আসুন। মৃন্ময় বাবু বললেন 'এই বয়সে হাঁটু নিয়ে যা সম্যসায় ভুগছি তাতে পাহাড়ে ওঠার জো আছে কি!' ঠিক তখনই অমলবাবু যিনি পেশায় শিক্ষক ও দার্শনিকও বটে তিনি বললেন তাহলে এই আগামী রবিবার আপনাদের সবাইকে এমন একটা জায়গায় নিয়ে যাবো সেখানে গেলে আপনি নিশ্চই প্রশান্তির খোঁজ করার উপায় পাবেন। সবাই তখন জিজ্ঞেস করলো কোথায় সেই জায়গা? অমলবাবু মুচকি হেসে বললেন সেটা না হয় গোপনই থাক। সেই কথামতো রবিবার অমলবাবু, মৃণয় বাবু ও আরো কয়েকজনকে নিয়ে গাড়ি করে রওনা হলেন। স্বাভাবিক ভাবে মৃন্ময় বাবু সহ আরো বেশ কয়েকজন জিজ্ঞেস করলো তাহলে আমরা কোথায় যাচ্ছি? অমলবাবু বললেন 'একটু অপেক্ষা করুন ঠিক বুঝতে পারবেন'। বেশ কিছুক্ষণ কেটে গেছে আর গাড়িতে সবাই ঠাট্টা তামাশা করছে। তবে মৃন্ময় বাবুর কিছুতেই স্থির থাকতে পারছেন না। যত সময় বাড়ছে তত তার কৌতূহল কেমন বেড়ে চলেছে। তখনই মৃন্ময় বাবু দেখলেন গাড়িটি এক সংকীর্ণ মাটির রাস্তায় প্রবেশ করলো। তিনি বুঝতে পারলেন যে তিনি শহরের বেশ কিছুটা দূরে চলে এসেছেন তাই তিনি অমল বাবুকে জিজ্ঞেস করলেন যে তাদের আর কতক্ষণ সময় লাগবে। অমলবাবু বললেন এই তো প্রায় চলে এসেছি এরপর গাড়িটি সেই সংকীর্ণ পথ পেরিয়ে এক নির্জন গ্রামে প্রবেশ করলো। কোথাও কোনো লোকজন নেই, কেমন যেন থমথমে পরিবেশ। এই অবস্থায় গাড়িতে বসে থাকা একজন বলে উঠলো তুমি আমাদের এই গ্রামে নিয়ে এলে! অমলবাবু বলেন এখানেই তো আমরা প্রশান্তি অনুভবের উপায় খুঁজে পাবো। তখন আরেকজন আড্ডার ছলে বলে উঠলেন উপায় খুঁজে না পেলেও ভূতকে ঠিক আমরা খুঁজে পাবো। এই কথা শুনে সবাই হো হো করে হেসে উঠলো! এইসময় মৃন্ময় বাবু বললেন দুপুর তো প্রায় হয়ে এলো তো প্রশান্তির খোঁজ কী উপায় পাওয়া যাবে শুনি? অমলবাবু বলেন প্রশান্তির খোঁজ করতে হলে আজকের রাত্রি আমাদের এখানেই কাটাতে হবে

আর তিনি এটাও বললেন যে আজকে থাকার ব্যবস্থাও ইতিমধ্যেই করে রেখেছেন। এতদূর সবাই যে উদ্দেশে এসেছে তা সফল না হলে দিনটা যে ব্যর্থ হয়ে যাবে তা ভেবে তারা সবাই অমল বাবুর কথায় তারা রাজি হয়ে গেলেন।

সেদিন সবাই দুপুরে এক রেস্তোরাঁয় খাবার খাওয়ার জন্য উপস্থিত হলেন। মৃন্ময় বাবু শহুরে প্রকৃতির মানুষ তিনি তাই এইরকম গ্রামে এসে একটু ইতস্তত বোধ করছিলেন। বিকেলে সবাই অমল বাবুর ঠিক করা এক বাড়িতে এলেন। বাড়িটা দেখে মনে হচ্ছিল বেশ পুরোনো। এইসব দেখে মৃন্ময় বাবু বললেন এই বাড়িটা আজকে রাতে থাকার জন্য নিরাপদ তো? অমলবাবু আশ্বাসের সুরে বললেন হ্যাঁ অবশ্যই। এতক্ষণ মৃন্ময় বাবু মনে প্রশান্তি খোঁজ করার জন্য মন আকুল হয়ে উঠছিল এবার অন্যদেরও সেরূপ অবস্থা হল বৈকি। সবাই বললো এবার তো বলুন প্রশান্তির অনুসন্ধানের উপায় কী? অমলবাবু বললেন ঠিক আছে তাহলে একটু বাইরে চলুন। সবাই তার কথামতো বাইরে বেরিয়ে এলেন এরপর অমলবাবু সবাইকে আকাশের দিকে তাকাতে বললেন। সবাই লক্ষ্য করলো নীল আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ আর এক ঝাঁক তারা। তখন মৃন্ময় বাবু বলে উঠলেন এ আবার নতুন কি এতো বাড়ির ছাদে উঠলেও দেখা যেত। অমলবাবু বললেন হ্যাঁ তা দেখা যেত ঠিকই। তখন সবাই বলে উঠলো তাহলে এই শুধুমাত্র চাঁদ দেখার জন্য এতো দূর আসার কি দরকার ছিল আর এটা কি করে প্রশান্তির অনুসন্ধানের উপায় তা বোঝা গেলো না। অমলবাবু বললেন একটু মন দিয়ে সবাই কিছুক্ষণের জন্য আবার আকাশের দিকে তাকান তাহলে বুঝতে পারবেন। সবাই সেই কথামতো আবার সবাই আকাশের দিকে তাকালো এবং বেশ কিছুক্ষণ পর অমল বাবু জিজ্ঞেস করলেন কি এবার তো নিশ্চয় উপায়টা পেয়ে গেছেন। তখন মৃন্ময় বাবু বললেন উপায় খুঁজে না পেলেও মনে এক অদ্ভুত অনুভূতি জেগে উঠলো আর এই অদ্ভুত অনুভূতি এর আগে অনুভব করেছে কিনা আমার মনে নেই। ঝিঁঝি পোকার আওয়াজ, জনমানবহীন শুনশান গ্রাম, পূর্ণিমার চাঁদের আলো এসবকিছু যেন একটুকরো স্বর্গের মতো লাগছিল। ঠিক তখনই অমলবাবু মুচকি হেসে বললেন দেখলেন তো সবকিছুর মধ্যে প্রশান্তি লুকিয়ে আছে তবে আমরা কখনোই খোঁজার চেষ্টা করি না। মৃন্ময় বাবু তা বুঝতে পারলেন আর বললেন আপনি যদি আজ না থাকতেন তাহলে আমরা বোধহয় এই জন্মে প্রশান্তির খোঁজ পেতাম। এই কথা শুনে অমল বাবু সহ বাকিরা বেশ খোশ মেজাজে হাসতে লাগলেন।

স্মৃতির ডাক

দিয়া কর, (তৃতীয় সেমিস্টার, বিভাগ-ইংরেজি)

চেনা সেই গেট আর বন্ধুর হাঁক
প্রতিটি ডিপার্টমেন্টে লুকিয়ে আছে হাজার
স্মৃতির ডাক
ক্লাসরুমের ওই বেঞ্চে লেখা 'নাম
প্রতিযোগিতার যুগে ওই বন্ধুত্বেরই বেশি দাম
ক্যান্টিনের ওই আড্ডা আর লাইব্রেরি রুমে চুপ
ফেলে আসা দিন গুলোই ছিল জীবনের আসল-স্বরূপ
হারানো সেই সময় গুলো আজও অপরূপ।

তালদিঘি

বান্টি ঘোষাল (ইংরেজি বিভাগ, সেমিস্টার - IV)

জানিও অখিল সেই শুষ্ক তালদিঘির তটে
তুমি যেথায় লইয়া গিয়াছিলে মোরে;
শুনাইয়াছিলে কতশত কাহিনী
দুঃসাহসী রাক্ষস-পেত্নী ও দত্যি-দানবের।
যাহার পার্শ্ব দিয়া চলিয়া গিয়াছে হরিৎ দিকপাল,
তৃণ-গালিচা বিছাইয়াছিল দিঘির প্রান্তর;
তাহারই মধ্যিখানে
একখানি স্থান করিয়া দখল
জাগিয়া ছিল সেই এক 'রাখাল'।
সে আপন মনে মদনেরে ধ্যান করিল
আমি তোমার তর্জনী ধরিয়া রহিলাম ধীরে।
সে আজি আর নাই।
কপূরের ন্যায় উধাও হইয়াছে সেই গালিচার সংস্রবও;
সেখানে তো কেহ আসিত না,
কেহ বা রাখিত না চরণ;
তাহা জানি না অখিল।
কেন ক্রোধভরে উড়িয়া গেল সেই হরিৎ গালিচা?
অধুনা তথায় কাঞ্চনা বালিয়াড়ি রাজত্ব করে
তাহা দেখিয়াই স্মৃতিপটে উদিত হইল
তোমারই কথা।
অখিল, মনে কি পড়ে সেই ছায়া?
রাখাল যেথায় বুনিয়াছিল মায়া
মদনের বংশীধ্বনি আজি স্তব্ধ হইয়াছে
মরুভূমি আজি মাখিয়াছে বৈকালী সাজ।
যেথায় ছিল তৃণ, যেথায় ছিল প্রাণ,
সেথায় আজি কেবল হাহাকারের গান।
দিঘির পলিরা আজি পাষাণ হইয়াছে
স্মৃতিরা সেথায় পায় না কোনো ত্রাণ।
রাক্ষস-পুরী কি তবে মিলাইয়া গেল?
সবুজের দেশ আজি ধূসর উৎসবে মত্ত।
তুমি নাই বলিয়াই তালদিঘি রোদন করে,
বালিয়াড়ি আজি নিজেকেই ফাঁদে ফেলে।
ফিরিয়া এসো তবে আর একবার,
উন্মোচন করো সেই গল্পের দ্বার;
শুষ্ক দিঘিতে বারি ফিরিয়া আসুক,
সবুজ জাগিয়া উঠুক বালিয়াড়ি বিদীর্ণ করিয়া।
সূর্য যখন অস্তাচলে যাইবে
আমি তখন বাইব না এই তরী
রহিবে মাঝি, থাকিবে না মোর
কোনো ভয় কিংবা আশ্বাস।
শুষ্ক সেই দিঘির তটে
ছায়া যখন দীর্ঘতর হইবে,
অখিল, তুমি কি খুঁজিবে মোরে?
রাক্ষস-দানব সব তো ছিল কল্পনা
বালিয়াড়িতে মিশিয়া গিয়াছে আজ;
তবু সেই রাখাল বালক
স্মৃতির ভিড়ে তর্জনী নাড়ে।
কেন যে তৃণ অভিমানী হইল?
কেন যে পথ ধূসর হইল?
সে উত্তর জানি না অখিল।
কেবল জানি, ওই কাঞ্চনা বালুকা
তোমারই কথা কহিয়া যায় কানে;
যেথায় জীবন গালিচা ত্যাগ করিয়া
উধাও হইল কপূরের টানে।
শুষ্ক দিঘির তটে বসি স্মৃতির বুনি জাল,
অখিল তুমি কোথায় গেলে কাটিল কত কাল।
রাখাল বালক একাকী জাগে তৃণের গালিচায়,
সবুজ পাহাড় হারাইল আজি ধূসর বালুকায়।
রাক্ষস আর দত্যি-দানব রূপকথা সব শেষ,
কাঞ্চনা ওই বালিয়াড়ি আজি যে নিরুদ্দেশ।
পদ্মদীঘির শুষ্ক বুকে হাহাকারের তান
মাঝি ব্যতিরেকেই বহিছে তরী জীবন অবসান।

গয়াতে পিন্ডি চটকানো

সৌভিক পাল (ইংরেজি বিভাগ, ষষ্ঠ সেমিস্টার)

ব্যাবসার কাজে বিদেশ সহ প্রায় অর্ধেক ভারতবর্ষ ভ্রমণ হয়ে গেছে কিন্তু এইরকম ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা আর কোনোদিন হয়নি। আমাদের একটা রীতি আছে যে কারোর অপমৃত্যু হলে গয়াতে গিয়ে তার নামে পিন্ড দিতে হয়। আমার দাদুর (ঠাকুরদা) অপমৃত্যু হয়েছিল, তো দাদুর পিন্ড দান করতে আমরা গিয়েছিলাম গয়াতে। গয়াতে যাবার আগে আমরা শুনেছিলাম যদি কেউ গয়াতে পিন্ড দান করতে ট্রেনে করে যায় তাহলে মৃতের নামে ট্রেনে একটা সিট বুক করতে হয় এবং সেই সিটে কেউ বসতে পারবে না। যিনি বা যারা ওনার পিন্ড দান করবে তারা যাবার আগে হাতজোড় করে ওনাকে নিমন্ত্রণ করবেন যে "ওনার আত্মার শান্তি কামনার জন্য আমরা ওনার পিন্ড দান করতে যাচ্ছি এবং উনি যেন আমাদের সাথে গয়া যায়" এবং ওনার আত্মা তাদের সাথে সাথে গয়া যাবে ট্রেনে করে, ঠিক ওই সিটে বসেই এবং ওই সিটে কেউ বসে বা শুয়ে যেতে পারবে না। আবার ওখানে নাকি প্রেত গয়া বলে একটা জায়গা আছে এবং সেখানে নাকি অন্ধকার জায়গার ভেতর একটা কুয়ো আছে, সেই কুয়োতে ভুতেরা থাকে এবং সেই কুয়োতে পিন্ড দান করতে হয়। দান করার সময় কয়েকজন পাণ্ডারা যাবে সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন কুয়োতে এবং পিন্ড কুয়োতে ফেলে দিয়ে ছুটে পালিয়ে আসতে হবে নয়তো ভুতেরা এসে ধরবে। বাঙালির রীতি, লোকের কথা লোকে শুনে চলে বেশী। সেই অনুযায়ী ট্রেন টিকিট কাটলাম। আমি, মা, বাবা, কাকা এবং কাকার একজন বন্ধু তিনিও ওনার মায়ের পিন্ড দান করবেন। ট্রেনের টিকিট আমিই কেটেছিলাম অনলাইন থেকে কিন্তু মজার বিষয় হলো দাদুর জন্য আমি লোয়ার বার্থ রেফারেন্স করেছিলাম এই ভেবে যে একেই দাদু বৃদ্ধ হয়ে গেছে তারপর আবার প্রতিবন্ধী, যতই ভুত হোক কিন্তু ভাঙ্গা পা নিয়ে ওপরের সিটে উঠতে পারবে না তো। যদি এদিক ওদিক কিছু হয়ে যায় উঠতে গিয়ে শেষে গিয়ে সেই আমাকেই ধরবে আর বলবে "তুই জানিস না আমার ঠ্যাং ভাঙ্গা তাহলে ওপরের সিট কেনো বুক করেছিস?" দীর্ঘবছর আগে বাড়ির চাল থেকে পড়ে পায়ের উপরের অংশ, উরু, ভেঙ্গে গিয়েছিল দাদুর। বাঙালি লোকজন ডাক্তারের কাছে না গিয়ে সবার প্রথমে গিয়েছিল মুড়াগাছা, গাছ বার্ধতে। আচ্ছা গাছই যখন বাঁধলো তাহলে ওটা বেঁধে রাখার নিয়ম হচ্ছে ২৪ ঘন্টা, সেটা তো ঠিকঠাক পালন করুক, না! প্রচন্ড যন্ত্রনা হচ্ছে বলে সেটা খুলে ফেলেছিল। তারপর অনেক ডাক্তার দেখিয়েছিল কেউ ভাঙ্গা জায়গাটা জোড়া লাগাতে পারেনি, টাকা পয়সার সমস্যা ছাড়াও আরও অনেক সমস্যা ছিল। তারপর আর কি! সেই ভাঙ্গা পা আর একটা লাঠি সঙ্গী হয়ে গেল দাদুর। গয়া যাবার কয়েকদিন আগে বাবা আমাদের পাশের পাড়ার এক ঠাকুরমশাই-এর সাথে গয়া যাবার বিষয় নিয়ে আলোচনা করছিল, তিনি বলেন যে ওসব ফালতু কথা, কোনো টিকিট লাগেনা মৃতের নামে আর তাকে কোনো নিমন্ত্রণ বা হাতজোড় করে কোনো অনুরোধও করা লাগে না। তারপর দাদুর নামে কাটা টিকিটটা ক্যানসেল করে দিলাম। কিছু টাকাও বেঁচে গেল।পৃষ্ঠা ২৩০ শে অক্টোবর, ২০২১ আমাদের ট্রেন ছিল হাওড়া থেকে রাতে। নো হাত জোড়, নো অনুরোধ, নো নিমন্ত্রণ, ট্রেনে উঠে পড়লাম। কাকা থাকে বর্ধমানে। কাকা আর কাকার বন্ধু ট্রেনে উঠলো বর্ধমান থেকে। ভোর ৫ টা নাগাদ গয়ায় নেমে পড়লাম। ট্রেন থেকে নামতে না নামতেই "কোথায় যাবেন দাদা? আমি নিয়ে যাচ্ছি। দাদা এদিকে আসুন। দাদা আমার দিকে আমার দিকে।" আমাদের প্রথম গন্তব্য ছিল ভারত সেবাশ্রম সংঘ। এটি একটি ধর্মশালা, বিশেষত বাঙালিদের জন্য, গেরুয়া বস্ত্রধারী সন্ন্যাসীরা সাধারণত এই সংঘ চালান, বেশ ভালো পরিবেশ। প্লাটফর্মে কারোর কথা না শুনে কোনো রকমে স্টেশনের বাইরে বেরোলাম, পরিস্থিতি এমন যেন আমাদেরকে ওরা নিয়েই যাবে, শেষে ব্যাগপত্র ধরে টানাটানি। আর কি অসম্ভব বাংলা বলে শুনে মনেই হবে না যে ওরা বাঙালী নয়। স্টেশনের বাইরে থেকে একটা অটো ঠিক করলাম। প্রায় ২০ মিনিট পর গাড়ি থামিয়ে বললো ভারত সেবাশ্রম এসে গেছে

নেমে পড়ুন। নেমে পড়লাম। অটো চালক সাথে একজন হেল্পার আমাদের ব্যাগপত্র নামিয়ে দিলো। একটা ছোট বিল্ডিং, তিনতলা মতন হবে সম্পূর্ণ বিল্ডিং ব্রিটিশ আমলের লাল রং করা। শীতের রাত এখনও সূর্য ওঠেনি। ল্যাম্পপোস্ট-এর আলোতে বিলিডিংয়ের গায়ে বড়ো বড়ো করে বাংলায় লেখা পড়লাম 'ভারত সেবা আশ্রম'। তখনই দরজা খুলে একজন গেরুয়া বস্ত্রধারী সন্ন্যাসী বেরিয়ে আসলেন। অটোর হেলপার বলে উঠলো মহারাজ এনারা এসেছেন। তখন মহারাজ বললেন আসুন, আসুন, ভেতরে আসুন। আমি ভেতরে ঢুকতেই যাবো এমন সময় পেছন থেকে কাকা বলে উঠলো "এ কোথায় নিয়ে আসলে?" আমার পা দাঁড়িয়ে গেলো। কী কেস? কাকা বললো আমরা ভারত সেবাশ্রম সংঘে যাবো তোমরা এ কোথায় আনলে? আমি ভালো করে আবার নামটা পড়লাম যেটা বিল্ডিংয়ের গায়ে লেখা। তখনই অটো ড্রাইভার বলে উঠলো এইতো বড়ো বড়ো করে লেখা 'ভারত সেবা আশ্রম'। মহারাজ বললো এটাই ভারত সেবা আশ্রম। কাকা বললো না এটা না, ভারত সেবাশ্রম সংঘ অনেক বড়ো, ঢোকার মুখে একটা বড়ো গেট আছে, সেখানে বড়ো বড়ো করে লেখা আছে 'ভারত সেবাশ্রম সংঘ'। বাবা বললো চলো, যেখান থেকে আমাদের নিয়ে এসেছিলে সেখানে নিয়ে চলো, তোমাদের সাথে আর কোথাও যাওয়া যাবে না, তোমরা সব দালাল। তারপর কত কীর্তি। আবার অটোটে ওঠা হলো ঠিক হলো এবার ওরা সঠিক জায়গায় নিয়ে যাবে। আসলে কাকা গয়া আসার আগে বর্ধমানের ভারত সেবাশ্রম সংঘের অফিসে গিয়েছিল। সেখানে গয়ার আশ্রম সম্পর্কে তারা বর্ণনা দিয়ে দিয়েছিল এবং সাবধানও করে দিয়েছিল যে গয়ায় প্রচুর নকল ভারত সেবাশ্রম সংঘ আছে এবং সেখানে গেলে যা কিছু হতে পারে। দাদুর কৃপায় সে যাত্রা বেঁচে গেলাম। তারপর প্রায় আঁধ ঘন্টা, অটো নিয়ে গেলো আসল জায়গা। বর্ণনা অনুযায়ী মিলে গেলো। বিশাল বড়ো এক বিল্ডিং, প্রচুর জায়গা এবং খোলামেলা। আমরা স্নান করে হালকা খেয়ে রেডি হয়ে নিচে চলে এলাম আশ্রমের অফিসে। সেখান থেকে পিন্ড দানের সামগ্রী, একটা ভাড়ার অটো এবং একজন ব্রাহ্মণকে আমাদের সাথে দিলো যিনি দুজনেরই, আমার দাদু আর কাকার বন্ধুরা মা-এর পিণ্ডদানের সমস্ত কিছু করবেন। অটো করে সবার প্রথম গন্তব্য ফাল্গু নদীর তীর যেখানে প্রথমে শ্রাদ্ধ হবে। যাত্রাপথে অটো একটা জায়গায় দাঁড়ালো। এক ঝাঁক লোক এসে এক সাথে আমাদেরকে জিজ্ঞেস করতে লাগলো তোমার বাড়ি কোন গ্রামে? খানা? জেলা? যথাযত উত্তর: কালিপুর, শান্তিপুর, নদীয়া। বাড়ি আদৌ শান্তিপুরে নাকি বাংলাদেশে? উত্তর: না! না! শান্তিপুর। শান্তিপুর তো নাকি বাংলাদেশ? উত্তর: আরে না! শান্তিপুর। প্রত্যেকের হাতে একটা ছোট খাতা আর কলম, সব উত্তর তারা ওটাই লিখে রাখলো। সেই একই প্রশ্ন কতজন যে জিজ্ঞাসা করলো তা গুনলে ১০০ জন আরামে পার হয়ে যাবে, উত্তর না দিলেও হবে না আবার, তাহলে অন্য বিপদ। তারপর গন্তব্যে পৌছালাম। শুকনো ফাল্গু নদীর মাঝখানে একটু জল। সেই জল এনে শ্রাদ্ধ শুরু হলো। তারপর আসলো একজন পান্ডা, তখন আমার থেকে বছর চার-পাঁচেক বড়ো হবে ছেলেটা, ধুতি-পাঞ্জাবী পরা, কপালে কালো তিলক কাটা। ব্রাহ্মণ উঠে দাঁড়ালো, ছেলেটি ওই আসনে বসে কিছু মন্ত্র বললো তারপর বলে উঠলো ২০০০ টাকা লাগবে। বাবা বলে উঠলো অতো! ১০০ টাকা দিচ্ছি। সে কিছুতেই কিছু হয় না। ছেলেটি আমার বাবা কাকার সাথে পেরে উঠছিল না তারপর বছর পয়ত্রিশ বয়সের আর একজন পান্ডা এলো, হাতে লাল রঙের এক বিশাল খাতা। এবার ওখানে উনি গিয়ে বসলো আর বললো এটা আমার ভাই হয়। খাতা খুললো আর বললো আপনাদের এলাকায় বাড়ি, নাম অমুক, বাবার নাম তমুক চেনেন? বাবা বললো হ্যাঁ। ওরা এখানে এসেছিল পিন্ড দিতে। তারপর আমাদের এলাকার একের পর একজনের নাম বলতে থাকে। মনে হলো পুরো পশ্চিমবঙ্গ-বাংলাদেশের লোকের চোদ্দগুষ্টির ডিটেলস ওদের কাছে আছে। তখন বুঝতে পারলাম লোকজন সব এসে এতো নাম, ঠিকানা জিজ্ঞাসা করছিল কেনো, ওরা যে এতো কিছু রেকর্ড করে রেখেছে দেখে অবাকই হলাম আবার সেটা খুঁজেও বার করেছে। তারপর পান্ডাটা জিজ্ঞাসা করলো আমার ভাই কত চেয়েছে? বাবা বললো ২০০০। পান্ডা: আর আপনি কত দিতে চেয়েছেন? বাবা: ১০০। পান্ডা: লজ্জা করে না আপনার, কোথায়

২০০০ আর কোথায় ১০০! বাবা বললো ঠিক আছে তাহলে ১৫০ দিচ্ছি। সে বাজারের দামাদামির মতন। ১০০-১৫০-২০০-৩০০..... শেষে ৫০০ টাকা ঠিক হলো। টাকা নিলো তারপর পিন্ড হাতে নিয়ে অল্প কিছু মন্ত্র পড়লো ব্যাস শ্রাদ্ধ সম্পন্ন। সেখানে একটা জায়গায় চটি খুলে রাখার জায়গা আছে। চটি রেখে খালি পায়ে হেটে হেটে যাওয়া হলো বিষ্ণুপদ মন্দিরে। বেশী দূর না। মন্দিরটা বেশ সুন্দর দেখতে, পুরো কালো রঙের পাথর দিয়ে তৈরী। মন্দিরের ভেতরে আবার একটা পান্ডা এসে হাজির। এনার বয়স পয়তাল্লিশ এর কাছে হবে, শার্ট প্যান্ট পরা। এসে পিন্ড ছুঁয়ে কিছু মন্ত্র বললো তারপর আবার সেই টাকা চাওয়া। আবার দরদাম করার পর ৪০০ টাকা দেওয়া হলো। মন্ত্র বললো তারপর বললো মন্দিরটা ৭ বার প্রদক্ষিণ করুন। এই মন্দিরের বিষ্ণুদেবের আবার ১টা পা। যাইহোক ৭ বার প্রদক্ষিণ করে একটু ঘুরে বেরিয়ে দেখলাম মন্দিরটা। সেখান থেকে আবার ফিরে আসা হলো যেখানে শ্রাদ্ধ করা হলো। এবার যেতে হবে অক্ষয়বট নামক জায়গায়। চটি নিতে গিয়ে দেখি আমার চটি নেই, নতুন চটি! সবার চটিই ছিল আমারটা চুরি হয়ে গেছে। আর এক বিপদ! অন্য কোনো উপায় না দেখতে পেয়ে ঠিক আমার চটির মতন দেখতে আর একজোড়া পুরোনো, একটু ছেঁড়া চটি পায় দিয়ে চললাম অটোর কাছে। এখনও পর্যন্ত যত ভিখারি দেখলাম, আর কোথাও এতো ভিখারি দেখি নি। মনে হলো ভিখারিদের ইউনিয়ন আছে।পৃষ্ঠা ৪অটোতে চড়ে অক্ষয়বট। সেখানে আবার একটা ঘরের ভেতর ব্রাহ্মণটি আবার কিছুক্ষন ধরে সেখানকার নিয়মানুযায়ী কাজকর্ম করলো। আবার আরেকজন পান্ডা আবার তার দাবী মেটানো এইসবই চললো। তারপর ওখানে একটা বট গাছ আছে মানে ওই অক্ষয়বট, এর চারপাশে সাতপাক ঘুরতে হবে। সাতপাক ঘুরতে ঘুরতে ভিখারিদের পাল এসে হাজির, সে ওখান থেকে নড়তেই দেবে না যতক্ষণ না পর্যন্ত টাকা দিচ্ছ। একজন তো তার গামছার কোছে চাল নিয়ে পাক ঘুরতেই যাবে ভিকারীরা এসে তাকে মেরেধরে চাল কেড়ে নিয়ে চলে গেলো। কোনোরকমে ওদের থেকে বেঁচে বেরিয়ে আসলাম অটোর কাছে। দুজন ভিখারি পেছন পেছন ওখানে চলে গেছে, কাকা শেষে টাকা দিলো তারপর গেলো। এসে আরেক কান্ড। রিজার্ভ করা অটো ওয়ালা অন্য ভাড়া পেয়েছে, আমাদেরকে রেখে চলে গেছে। শেষে ব্রাহ্মণ ফোন করে অন্য অটো জোগাড় করলো। এবার গন্তব্য প্রেত গয়া। কাকার বন্ধুর মায়ের পিণ্ডদানের কাজকর্ম এখানেই শেষ হলো কিন্তু দাদুর অপমৃত্যু হওয়ায় আমাদেরকে প্রেত গয়া গিয়ে পিন্ড দিতে হবে। সবাই মিলে প্রেত গয়া। মাঠ-ঘাট, ছোট ছোট কয়েকটা পাহাড় পেরিয়ে গয়া শহর থেকে অনেক দূরে প্রেত গয়া, কোনো বসবাস নেই। একটা ছোট পাহাড়। পাশে একটা অনেক গভীর, একদম নিচ পর্যন্ত শান বাঁধানো পুকুর যার ভেতরে জল নেই। আশেপাশে কয়েকটা খাবারের দোকান আছে। পাহাড়ের গা ঘেঁষে একটা ছাদ দেওয়া খোলামেলা জায়গা সেখান আবার ব্রাহ্মণ তার কাজকর্ম শুরু করলো, কাজ শেষে আবার পান্ডা এবার দু-চারজন একসাথে, প্রত্যেকেইর বয়স বছর ষাট-এর ওপরে ওদের ভেতরে একজন পিন্ড নিয়ে অর্ধেক মন্ত্র বললো তারপর ৫০০০ টাকার দাবী। বাবাও বাবার রাস্তা ধরলো, ২০০ টাকা দেবো। তখন ওই পান্ডাটা বলে উঠলো তোর বাবার পিন্ড আমি নেবো মাত্র ২০০ টাকায়! থাক পড়ে পিন্ড বলে উঠে একটু দূরে গিয়ে বসলো। বাবা আর কাকা দুজন হাত জোড় করে ওখানেই বসে থাকলো। এমন সময় একটা ছেলে এলো চারচাকা গাড়ি নিয়ে। বছর তিরিশের মতন বয়স। প্যান্ট শার্ট পরা, ইন করা, দেখে মনে হলো ভালো পয়সাওয়ালা ঘরের ছেলে। মায়ের পিন্ড দিতে এসেছে। ওই পান্ডাটাই ওর মায়ের পিন্ডর কাজকর্ম করে তিরিশ হাজার টাকা চাইলো। আমি শুনে অবাক! ওই ছেলে বলে আমার কাছে এতো টাকা তো নেই। পান্ডা বললো আমি কিছু জানি না তুই যদি তিরিশ হাজার টাকা না দিস তোর মা-এর আত্মার শান্তি হবে না। সুযোগ বুঝে কোপ মারলো। ছেলেটা পুরো ঘাবড়ে গেলো ওর মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছিলো। শেষে গাড়ির ভেতর থেকে কুড়ি হাজার টাকা নিয়ে এসে বললো এই আছে আমার কাছে আর কিছু নেই। তারপর শেষমেশ কুড়ি হাজার টাকা নিয়ে বাকি মন্ত্র বলে বললো যা তোর মায়ের আত্মার শান্তি হলো। এদিকে আমাদের বসিয়েই রাখলো। প্রায় ঘন্টাখানেক পর এসে বললো কত দিবি

শেষে অনেক কথাবার্তা বলে ৫০০০ থেকে সোজা ৫০০ টাকায় নামিয়ে আনলো বাবা। ৫০০ টাকা নিয়ে বাকি কাজকর্ম করলো। এবার বাবা-কাকা পিন্ড হাতে, ব্রাহ্মণ নিয়েগেলো পাশেরই একটা মন্দিরে। সেখানে পিন্ড রেখে ব্রাহ্মণ আবার কিছুক্ষন মন্ত্র বলে বললো এবার পিন্ড দানের সময় এসেছে কোথায় পিন্ড দান করবেন এই মন্দিরে নাকি পাহাড়ের মাথার মন্দিরে? বাবা বললো কোথায় দিলে ভালো হয় এখানে নাকি পাহাড়ের মাথায়? উনি বললেন পাহাড়ের মাথায়। বাবা বললো তাহলে চলো পাহাড়ের মাথায়। ৬৭৬ টা খাড়া সিঁড়ি ভেঙে পাহাড়ে উঠতে হবে। মা বললো আমি যাবো না, অতো সিঁড়ি ভাঙতে পারবো না। কাকার বন্ধুও উঠলো না। ব্রাহ্মণ যাবে না। আমি বললাম এতো দূর এসে যদি পাহাড়ের মাথায় না উঠে দেখি তাহলে পরে আপসোস হবে। আমরা তিনজন উঠতে থাকলাম। একটু উঠতেই ডান পাশে সিঁড়ির গায়ে একদম একটা ছোট্ট মন্দির পড়লো, কোনো একটা দেবীর ছোট্ট মূর্তি ছিল। একজন ব্রাহ্মণ দাঁড়িয়ে। হটাৎ উনি বলে উঠলো পিন্ড দিতে গেলে মায়ের পায়ে পিন্ড ঠেকিয়ে নিয়ে যেতে হয়। আমরা ভাবলাম হয়তো মায়ের পায়ে পিন্ড ঠেকাতে হয়। বাবা-কাকা মূর্তির পায়ে পিন্ড ঠেকালো তখন ব্রাহ্মণটা বললো আমার সাথে সাথে বলো বলে হাবিজাবি মন্ত্র বলতে শুরু করলো বাবা কাকা-ও মন্ত্র বলতে লাগলো শেষের দিকটা এরকম ছিল যে... আমরা আমার বাবার আত্মার শান্তি কামনার জন্য মায়ের পায়ে পিন্ড ঠেকিয়ে মায়ের নামে প্রত্যেকে ৫০০ টাকা মায়ের চরণে দান করলাম... বাবা বলে না ৫০ টাকা মায়ের চরণে দান করলাম। ব্রাহ্মণ বলে না না ৫০০ টাকা। এবার কাকাও বলে উঠলো উমঃ হুঃ ৫০ টাকা। সেই ওখানে ৫০ টাকা করে ১০০ টাকা দিয়ে উপরে উঠতে লাগলাম। একটু উঠতেই আবার একটা ঐরকম ছোট মন্দির বানিয়ে একজন ব্রাহ্মণ দাঁড়িয়ে সেও তাই বলে... বাবা, মায়ের পায়ে পিন্ড ঠেকিয়ে নিয়ে যেতে হয়। বাবা বলে ঠেকানো হয়ে গেছে। সে বলে না না এখানেও ঠেকাতে হবে। বাবা বলে লাগবে না আপনাদের ধান্দা বোঝা হয়ে গেছে। ওই পাহাড় উঠতে কত যে ঐরকম মন্দির বানিয়ে সব বসে আছে তার নেই ঠিক। ওদেরকে ইগনোর করে চলতে লাগলাম আমরা যেমন এরা তেমন ভিখারি এতো ভিখারি! ছোট ছোট পুচকে-পাচকারাও ভিক্ষা করছে, এসে সব পা জড়িয়ে ধরছে। আমার কাছে যা খুচরো টাকা ছিল ভিক্ষা দিতে দিতে সব শেষ। ৬৭৬ টা সিঁড়ি ভেঙ্গে উঠলাম পাহাড়ের মাথায়। অপূর্ব দৃশ্য! দূরে দূরে আরও অনেক পাহাড় দেখা যাচ্ছে, অনেক দূরে গয়া শহর দেখা যাচ্ছে আর চারিদিকে ফাঁকা মাঠ। পাহাড়ের মাথায় একটা মন্দির বানানোর ওখানে আবার একজন বসে, তিনি আবার কিছু টাকা নিলেন মন্ত্র পড়লেন। মন্দিরের সামনে একটা জায়গা করা সেখানে অনেক পিন্ড পড়ে রয়েছে, সেখানে পিন্ড দান করে সমস্ত প্রক্রিয়া সমাপ্ত করা হলো। তারপর আমরা তিনজন সেখানকার মনোরম দৃশ্য উপভোগ করলাম কিছুক্ষন ধরে। আমি বললাম বাবাকে, সে তো অন্ধকার জায়গাও দেখলাম না, কোনো কুয়োও তো খুঁজে পেলাম না, ভাবলাম পাহাড়ের মাথায় হয়তো, ঘন্টারমাথা! এখানেও তো কিছু নেই শুধু একটা মন্দির আর মন্দিরের ভেতেরও কোনো কুয়ো নেই। নিচে আসলাম, দোকান থেকে খাওয়া দাওয়া করলাম সবাই মিলে, দোকানদার বললো এখানে সন্ধ্যার পর কেউ থাকে না, পুরো জায়গা শুনশান হয়ে যায়, রাতে প্রেত আত্মা ঘুরে বেড়ায় এখানে, তাইতো এখানে কোনো ঘরবাড়ি নেই। আমার তো ভুত প্রেতের কিছু মনে হলো না। তবে এই খাড়া সিঁড়ি ভেঙ্গে পাহাড় চড়া আর নামার কারণে বাবা আর কাকার পরের দিন পায়ে খুব ব্যথা হয়েছিল কয়েকদিন তো ঠিক করে হাটতেই পারছিল না। গয়াতে দাদুর পিন্ড দিতে গিয়ে নিজেদেরই পিন্ডি চটকে গিয়েছিল। গয়া থেকে অনেক কিছু শিখলাম, কীভাবে মানুষের অসহায়তাকে সুযোগ করে ধর্মের নামে একটা বিশাল ব্যবসা চলছে এবং এখানে সবাই একে অন্যের সাথে যুক্ত এমনকি ভিকারিরাও। রাতেই আমাদের ট্রেন ছিল, এবার আমাদের তিনজনের গন্তব্য ছিল ব্যাবসার কাজে বেনারস আর কাকাদের বর্ধমান। সেখান থেকে শুরু হলো আর এক নতুন কাহিনী।

জানালা

দীপ দাস (ইংরেজি বিভাগ, ষষ্ঠ সেমিস্টার)

সচরাচর মানুষের নজর কারার মতো ক্ষমতাও রাখে না। থাকে পরে পৃথিবীর আর বাকি চার পাঁচটা অপদার্থের মতোই কিন্তু ও ওর কর্তব্যে কোনো ফাঁকিও দেইনা, তবে জানিনা আজকে মানব সমাজের কোন মতির উদয় হলো যে ওকে নিয়েও মানুষ ভাবছে। হয় হয়তো এমন, যখন কারোর সদ্য পৃথিবীকে পৃথিবীর মতো করে চিনতে পারার ক্ষমতা তৈরি হয়। ওর মধ্যে বিশেষত্ব কিছুই নেই, হাওয়ার দিকে দোলে হাওয়ার সাথেই, নাহলে আপন মনে সারা দিন বাইরের পৃথিবী দেখে। চার দেয়ালে আবদ্ধ কিছু দুই পেয়ো টিকটিকি বা দুই হাতের আরসোলা নিয়ে আর কত দিন?? এর থেকে ওর ভগবানের সৃষ্ট পৃথিবী অনেক সুন্দর, কত কি সেখানে। যায় হোক মোদ্দা কথাই আসা যাক। ওই জানালার সমগ্র জীবন কাল একটু কেমন যেনো অদ্ভুত তাই না? কত মানুষের নতুন আশার ইটের বুননের সাথে ওরও জন্ম হয়, একই সাথে ও সেই স্বপ্নের বাড়ির কৃতিত্ব রাখে, কিন্তু কখনোই বিশেষ ভাবে কারোর লক্ষ্যের বস্তু হয়ে উঠতে পারে না। জন্মের পরে কিছুদিন ওর গায়ে অন্য কোনো মাকড়সার জাল দেখা গেলে নির্দ্বিধায় তা পরিষ্কার করে দিতাম কিন্তু সময়ের ঘষা খেয়ে সেই মাকড়সাই কিছু সময় পর ওর প্রতিবেশী হয়ে গেলো। এর পর এই সংসার নিয়েই পৃথিবীর চক্র কাটতে থাকে নিজের নিয়মে। এর পর কত গরম আসে, কত দইওয়ালাও আসে, কিন্তু অমল জানালার লোহার শিক ধরেই বসে থাকে ওই দূর পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে। সময়ের তাগিদে এরপর বর্ষা নিজের অধিকার দেখাতে চাই, তখনও অপু গ্রামের বাড়িতে ওর দৃষ্টি দিয়েই প্রকৃতির এক অপরূপ রূপের সাক্ষী হওয়ার চেষ্টা করে। এরপর কত শরৎ, হেমন্ত, শীত, বসন্ত আসে, কত তেলেনাপোতা তে মনিদা যামিনী কে ওর মধ্যে দিয়ে দেখত পাই। ও নিজেও দেখেনা এমন না, ওরও দেখতে বেশ ভালই লাগে। জানালা নিজেও দেখে কতো বাগানবিলাস ফোটে, কতো পলাশ ঝরে যায়। কত বিড়াল সেই ঝড়া ফুলে খেলা করে। এমন সব ভালো কাটতে কাটতে একদিন হঠাৎ দেখা যায় জানলার ওই কাঠটাতে ঘুনের অবাঞ্ছনীয় প্রেমের আগমন ঘটেছে। তখন জানালা ভরা যৌবনে পা রেখেছে। তারপর আর কি! তারপর ও সব জেনে শুনেও একাকীত্ব দূর করার লোভে সেই ঘুণের সাথেই স্বপ্ন দেখতে শুরু করে। তারপর চলে অনির্দিষ্ট কাল স্থায়ী মারণ প্রেম.. কিন্তু কে জানে, কেনো তখনই মহাকালের ছড়িয়ে রাখা মায়ার অভরণের জলে টান দেওয়ার মন চায়। সব ফুরিয়ে আসার সময় হয়ে এসেছে হয়তো। অথচ আশ্চর্য ভাবে সব শেষ হয়ে যাওয়ার আগে একটা বিস্ময়কর ঘটনা ঘটে গেলো। রাস্তা চলতি ঘুন ধরা আর এক যুবক জানলাকে প্রশ্ন করে বসে ''তুমি মানব জাতিকে এত ভয় পাও কেনো?''

জানালা উত্তর দেই 'আসলে আমি দেখেছি মানবজাতির ভয়ংকর রূপ। আমি দেখেছি কিভাবে মানব জাতি কত সুনিপুণ ভাবে অন্যজনের হৃদয়ের খণ্ড বিখণ্ড করতে পারে, একটু মাত্রও কৃতজ্ঞতা না দেখিয়ে। আমি দেখেছি কিভাবে একজন মানুষ অন্যজন মানুষের হাতে থাকা ফুলটিকে অপমান করতে জানে আমি দেখেছি, দেখেছি কিভাবে মানুষ নিজের স্বার্থের শেষে ওপরওয়ালা কেও ভুলে যেতে পারে। আমি দেখেছি কিভাবে মানুষ শুধু একটু খাবার চুরির অপরাধে একটি বিড়ালের বাচ্চাকে খুন করতে পারে। আমি দেখেছি কিভাবে দিন শেষে জানলা বন্ধ করে আকাশ ভর্তি নক্ষত্রের অপমান করতে জানে। এর পর অভিমান কি খুবই অবৈধ? সব শুনে ভ্যাবাচ্যাকা খাওয়া সেই যুবক যাওয়ার সময় শেষ শব্দ হিসাবে শুধু নির্গত করতে পারল "শবই সত্য, শবই সুন্দর"। এরপর কোনো কোনো এক মেঠো বাড়ির নৈশ ভোজ তৈরির উনুনে বাঁশপাতা, আমের ডালের সাথে সেই জানালার ঘুন লাগা কাঠটি কে শেষ বারের মতো দেখা গেলো এই পৃথিবীতে। সত্যি, শেষ হয়েও শব হইলো না শেষ।

Gratitude List

Amrita Chakraborty
(English Department)

Things I am grateful for in winter
In the tropical temperate months
Train rides, woollen wraps and quiet
The setting sun golden
On yellow green of mustard fields
The orange Bougainville
Flaming into the morning
A sudden gust of breeze bringing dreams
Of white mountains
Crisp night time and the earth covered
In cool light of stars
Startling silence, and crickets
No lulling buzz of ceiling fans
Or sleep and forgetting,
But awakeness and the crushing sound
Of sorrows breaking down
And through all the moments
You.

A Cursed Night

Suvam Ghosh
(English Department, Sem-IV)

In a lonely dark night,
A sunflower was asleep, and..
she was dreaming about tomorrow,
the bright sunlight of tomorrow!
        In her dream…
She wished to spread her green wings
and shine with the sunlight again.
But then, a group of caterpillars arrived,
with venomous lust dripping from their jaws.
Hungry to tear the golden sunflower apart.
They rushed towards her and destroyed…
        her face, her dignity, her soul.
And all of this was happening,
right before the farmer's eyes.
        But…
He remained silent,
as those caterpillars were from his own

The Creator

A Delimitation

Koushani Sarkar
(Department of History , Semester - VI)

The Universe is boundless
Yet we have so many boundaries,
Creating the wrong and the right
Maybe to get the limelight.

We are one
Above every religion and every boundary wall,
But everyone in the world
Think it upright and that's where
The blueprint of God , the humanity fall.

The guesses or the guarantees
All are one with the truthfulness ,
But we all forget this thought
And also to confess this
With our thoughtfulness.

Now tell me, where is the Delimitation ?
I think it's a dilemma of ours' ;
Because the destination is one
But we are the delimitation creators.

সমন্বয়

প্রীতম কুমার দাস (বাংলা বিভাগ)

আমি তো একা।
জন্মেছিলাম একা মাতৃজঠর থেকে।
আমি তো জন্মেছিলাম বহু হয়ে।
আমি বর্ণ, আমি বর্ণমালা।
আমার মাতৃভাষা সমৃদ্ধ কত ভাষার অলংকৃত শব্দে।
একমেবা দ্বিতীয়ম্ সার্থক প্রজাপতি নামে।
একক বারিকণা জলস্রোতে গতিময়।
অসহায় নিঃসঙ্গতা, নির্জনতা,
জনসমাগমে শক্তিহীন।
বিকৃত বাঞ্ছা শাসিত সমাজ সমুদ্রে।
ব্যষ্টির বেদনা, অহং আনন্দ
সমষ্টি সম্পৃক্ত।
একটি চাঁদের জ্যোৎস্না,
বহুবচনীয় মুগ্ধতা।
একটি ভুল, অসংখ্য নির্ভুল।
একটি কাণ্ড শাখায় শাখায় কত ফুল।

A Conversation

Namrata Roy (Department of Chemistry)

11-year-old girl: Hello! How are you feeling today?

41-year-old woman: I am fine—just a bit tired, but well. How about you?

11-year-old girl: On cloud nine! You know, we were assigned to write a page about the thing we like the most in school. I think I did quite well, and when I read it out in class, I am sure it will turn out to be the best. I am so excited!

41-year-old woman: That's wonderful. And what is it that you like the most?

11-year-old girl: Animals—dogs, birds, elephants… I love them all. What do you like the most?

41-year-old woman: Me? Hmm, let me think. I like animals too—they are so refreshingly unpredictable, free, and simple. Aren't they? And plants—their journey from the first bloom in spring to when they lose everything and patiently wait to feel whole again… A cool, breezy half-moon night, watching the rain, sitting beside a lake…

11-year-old girl: Oh God! I am sorry for interrupting, but how will you write about so many things in your essay? Don't mind me, but I think you are a bit confused.

41-year-old woman: (smiling) I think you are right… and the list could go on. When I write, I suppose a lot of it will be left out. But that is fine as well. They will remain with me.

11-year-old girl: Make up your mind! Otherwise, your writing will not be the best. That would make you sad, wouldn't it?

41-year-old woman: (smiling) Don't worry, it wouldn't. It doesn't have to be the best. Writing itself is something I like, and that makes me happy enough.

11-year-old girl: Is that so? It's simpler for you, then. That wouldn't work for me, you know. I am so nervous about whether my teacher and classmates will like it.

41-year-old woman: I know, little one. Life can feel tough, can't it? I am sure everyone will like it. But even if someone doesn't, you enjoyed writing it, right? And the joy you feel around animals, will stay too! Hold on to that.

11-year-old girl: Hmm… okay. I will try. Your way sounds simpler, she said with a smile.

41-year-old woman: That is all you need to do. It takes time to find the simpler way.

সার

স্বস্তিক কর্মকার, প্রাক্তনী (২০২২-২৫)
ইংরেজি বিভাগ, শান্তিপুর কলেজ

পরিবারের বোঝা টানতে টানতে নিঃশেষিত দেহে, বাবাদের বাড়ি ফেরা।
বয়স্ক শরীর,
পচে যাওয়া, গলে যাওয়া,
দেহে বেঁচে থাকার একরাশ ইচ্ছা।
এ পৃথিবী যেন তার আপন, এ বোঝা তার অব্যাক্ত...

চোখের জলে নুইয়ে আসা পরিচয়,
একবার পায়ের দিকে, একবার সামনের দিকে-
আহঃ মাটি...

মৃত্যু যেভাবে জীবন কে আঁকরে ধরেছে...

তার কণ্ঠে নীরব প্রশয়;
মৃত্যু তখন তুচ্ছ।
তাঁর শেষ হয়ে যাওয়া।

শেষ ভালোবাসা

এ প্রীতম সিংহ (প্রাক্তনী, ইংরেজি বিভাগ)

এমনি ক'রে একদিন মনখারাপের মেঘ
গায়ে মেখে যখন তুমি, ধানের শিষের
ওপর দিয়ে দেখবে পড়ন্ত বিকেল--

আমি তখন রক্তিম সূর্য হয়ে মিশে
যাবো তোমার অক্ষিজলে।

হঠাৎ ক'রে এমনি এক বসন্তের সন্ধ্যায়
যদি মনে পড়ে আমার কথা,
ক্ষণিকের জন্য বা এক নিমেষে--

উঁকি দিয়ে দেখো ভাঙ্গা চিলেকোঠায়
খুঁজে পাবে আমায় এক ক্লান্ত জাতিস্মরের ভূমিকায়।
তুমি চেয়েছিলে বানাতে আমায়
বাগানবিলাস, কিংবা হাসনুহানা
সাজিয়ে রাখতে নিজের গোছানো
আঙ্গিনায়--

আমি হয়েছিলাম বুনো
কালকাসুন্দা, পলাশ ফুলের উত্তাপ
ও চাতকের তৃষ্ণা আমাকে স্বর্ণলতা হতে রক্ষা করেছিলো।

উপহারি নতুন যে বইটি--
প্রথম পাতাটিও যা তোমার অপঠিত--

তার সেই উপসংহারে প্রেমের নকশাল
লড়তে গিয়ে আজ আমি ন্যায়ের ফাঁসিতে ঝুলছি;

কথা রাখা হয়নি, কথারা থাকতে শেখেনি,
লেমিংদের সেই প্রাচীন অভিসারের মৃত্যু দৌড়ে আমিও একদিন শামিল হবো।

বিশুদ্ধ এক সত্তা হয়ে জয় করবো
এক ভুবনজয়ী উগ্র ভালোবাসা--
ফাঁসটা চেপে বসছে আর আয়না আমায় দেখে করছে উপহাস-- তবু শেষ করতেই
হতো এই বিষাক্ত নেমেসিস;

ক্ষণে ক্ষণে এ হৃদয় ফেলেছে
দীর্ঘশ্বাস, তোমার-আমার
ভালো থাকা এক নিবিড় পরিহাস।

মোবাইল ফোন

মো: মামুন অর রসিদ
(সহযোগী অধ্যাপক, গণিত বিভাগ)

তুমি বন্ধু, তুমি শত্রু, তুমি ভালোবাসা।
তোমা বিনা দিন কাটানো, বৃথা এ আশা!
রেডিও, ঘড়ি, টিভি সবাই গেল ছুটে,
তোমার জন্য ছাই তাদের প্রতি, ভালোবাসা টুটে।
বই, পত্রিকা ভাবছে বসে, আমাদের, কি হবে?
খেলার মাঠ অপেক্ষারত, বন্ধুরা কি কভু রবে?
বন্ধুর হাতের স্পর্শ আর কি ভাবছ সব কোথায়?
তুমি ভাবছ আমি থাকতে, বৃথা আশা ভাই।
শিক্ষক মশাই ক্লাসে বসে, পিন্টু, চিন্টু খুঁজে।
রাত্রিতে পড়াশুনা ছেড়ে সবাই, তোমার সাথে মজো
টর্চ লাইটটা, তাও নিয়েছ কেড়ে।
সকাল হওয়ার আগেই তুমি, এলার্মটা দাও নেড়ে।
ক্যামেরা ম্যানের চাকরিটা, হল বুঝি শেষ!
তোমার নিজের ক্যামেরা, সবার হাতে বেশ।
কোটি পতির বন্ধু তুমি, বন্ধু ভিখারীর।
তোমার প্রেমে পাগল সব, মানব ধরিত্রীর।

অপেক্ষা

- প্রত্যুষা ভট্টাচার্য্য
(ইংরেজি বিভাগ, তৃতীয় সেমিস্টার)

না হয় নাইবা হল দেখা
ভালোবেসে গেলাম আমি একা
গানের সুরে কল্পনাতে আমি-
দু-চোখের পাতা খুঁজে,
প্রকৃতির মধ্যে আমি যেন-
তোমাকে পাই খুঁজে
না হয় নাইবা হল দেখা
কথা গুলো থাক জমিয়ে রাখা
এ জনমে না হয় নাইবা হলো দেখা
তোমার ছবি হৃদয়ে আমার থাকবে সদা আঁকা
তোমার জন্য আমি অপেক্ষা করতে-
রাজি আছি জীবনভর,
কারন তুমিই আমার ভালোবাসা-
আমার হৃদয়চোর

ধর্ণা

অসীম সরকার
(বাংলা বিভাগ, শান্তিপুর কলেজ)

সরলরেখায়
রূপের পথে
হাট বসেছে
কারুণ্যভরা
মায়াবী চোখ
সংশয়ে কৃপণ
রাস্তায় রাস্তায়
বসে আছে
আমার ঈশ্বর

ব্রহ্মশ্মশান

সব আয়োজন শেষ হ'লে
নুনের গর্ভে ব্রহ্মচারী
শরীর জুড়ে উত্তরীয়
কপালে সূর্যআঁকা তিলক
মাথার ওপর কচুরিপানার
বাড়ন্ত সংসার,

এসো ধ্যান করি
গভীরে যায়...
তুলে আনি আরেক সংসার

পরিচিত নক্ষত্র

সর্বার্থ মুখার্জী (বাংলা বিভাগ)

যাচ্ছি চলে অনেক দূরে,
যেখান থেকে আসবো না আর ফিরে,
এই রূপ মুছে যাবে অগ্নির শিখায়,
অবশিষ্ট ভেসে যাবে গঙ্গার জলে।

রাত্রির অন্ধকার আকাশে
তারামন্ডলের সাথে মিশে,
থাকবো একটি উজ্জ্বল তারা হয়ে,
দেখবো সেখান থেকে পৃথিবীকে,
শস্য শ্যামলা এই ধরিত্রীকে।

আবার বহু বহু বছর পর
তুমি তখন অন্য কারোর ঘর,
তখন আমি আসবো আবার ফিরে,
নতুন রূপে নতুন বেশে।

পারবে নাকো তখন চিনতে,
পাস দিয়ে তুমি যাবে চলে,
একরাশ এই মানুষের ভিড়ে,
থাকবো আমি মিলে মিশে।

গভীর এক শান্ত রাতে,
যখন সবাই স্বপ্নের দেশে,
ছাদে গিয়ে খুঁজবে তুমি,
সেই উজ্জ্বল তারাটিকে।

দেখতে পাবে নাকো তখন,
আকাশের বুকে হারিয়ে গেছি,
মনে পড়বে হয়তো তোমার,
এক অন্ধকার রাতের বুকে,
একটি তারা পড়েছিল খসে,
জাগবে হাসি মুখে তোমার,
বুঝবে আমি ফিরলাম আবার,
এই পৃথিবীকে রাঙিয়ে দিতে।।

ভ্রমণ-বিভ্রাট

(সমাধান শিকারী, সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ)

আমরা চার বন্ধুরা মিলে ঠিক করলাম এবার ডিসেম্বরের ছুটিতে সবাই মিলে নৈনিতাল বেড়াতে যাব। কিন্তু টিকিট তো কাটা নেই। সবার দৃষ্টি গিয়ে পড়লো শুভাশীষের ওপর। ও আমাদের টিমের ম্যানেজ মাস্টার। যে ভাবেই হোক ও টিকিট জোগাড় করে ফেলবে। শুভ্রার আবার খুব ইচ্ছে যাওয়ার পথে একবার তাজমহল দেখার। জয়ের ও তাজমহল দেখা হয়নি। তাই ওরাও যেতে চাইল। অবশেষে টিকিট ম্যানেজ হল এভাবে;হাওড়া থেকে ট্রেন ধরে পরের দিন সকালে আগ্রা স্টেশনে। সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টায় ওখান থেকে লক্ষ্ণৌর ট্রেন ধরা হবে। রাত সাড়ে এগারোটায় লক্ষ্ণৌ থেকে কাঠগুদাম এক্সপ্রেস।

আগ্রা স্টেশনের ক্লোক রুমে সবার লাগেজ রেখে আমরা সকাল সকাল তাজমহলের জন্য রওনা দিলাম।আগ্রা স্টেশন থেকে ভাড়া গাড়িতে উঠতেই শুভ্রার বর সুজয়দা বলে উঠল, 'একটু আগ্রা ফোর্ট ঘুরে গেলে হত না?' ইতিহাসের মাষ্টারমশাই মোঘল যুগের স্থাপত্য কীর্তি পড়াতে গিয়ে ছেলেমেয়েদের কতবার যমুনা নদীর তীরে লাল বেলে পাথরের তৈরি এই ফোর্টের কথা বলেছে। আমার নিজেরও দেখা হয়নি। তাই উৎসাহ দেখালাম নামার জন্য। অবশেষে নামা হল। ডিসেম্বরের ছুটিতে সর্বত্রই প্রচণ্ড ভিড়। টিকিট কেটে ভেতরে ঢুকলাম। সম্রাট আকবরের তৈরি এই ফোর্টের কারুকার্য দেখে মুগ্ধ সবাই। যদিও এই ফোর্ট টি সেই সময়ে সামরিক ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহৃত হত। ওখান থেকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে রওনা দিলাম তাজমহলের উদ্দেশ্যে। ওখানেও লাইন দিয়ে টিকিট কেটে ভেতরে ঢোকার গেট পর্যন্ত পৌঁছলাম ট্রলি গাড়িতে চেপে। হাঁটা সম্ভব ছিলনা, সাথে তিনটি বাচ্চা পাঁচ, ছয় ও দশ বছরের। তারপর শুরু হল চেকিংয়ের এর লাইন। ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ বলে কথা। নাশকতার ভয়ে চিরুনি তল্লাশি শুরু। কাঁধের ব্যাগে থাকা অনেক জিনিসই নিরাপত্তা রক্ষীরা বাতিল করলেন। শুভ্রার ছেলে পাপালি ওর খেলনা বাতিল করার জন্য কেঁদে কেটে হয়রান হয়ে গেল। এরপর আমরা উপস্থিত হলাম ভালোবাসার সৌধের সামনে।

সকল বাঙালিরই একবার তাজমহল দর্শনের স্বপ্ন থাকে। সম্রাট শাহজাহানের বেগম মমতাজের স্মৃতির উদ্দেশ্যে রচিত ভালোবাসার সৌধের সামনে ভালোবাসার মানুষের হাত ধরে উপস্থিত হওয়ার অনুভূতিই আলাদা! আর এই অনুভূতিকে চিরস্থায়ী করতে ছবি তোলাটা খুবই জরুরি। আমরা সবাই নিজের নিজের ফ্যামিলির সঙ্গে ছবি তুলতে শুরু করলাম। স্যোসাল মিডিয়ার যুগ। ফেসবুকে কয়েকটা ছবি পোস্ট করতে না পারলে তো জীবনই বৃথা। তাজমহলের ভেতরে ঢোকা, চারপাশ পরিদর্শন, যমুনা নদী দর্শন এসব করতে করতে বিকেল গড়িয়ে গেল। সন্ধ্যাবেলা ট্রেন। সবাই ফেরার জন্য তাড়াহুড়ো করতে লাগলাম। এর মধ্যে জয়ের মেয়ে দেবাংশীর পায়ে একটু মচকা লেগে গেল। কোনোক্রমে জয় কোলে করে ওকে গেট পর্যন্ত এনে গাড়িতে তুললো। ড্রাইভার বেশ জোরেই গাড়ি চালাচ্ছিল ট্রেন ধরানোর জন্য। আমাদের স্টেশনে পৌঁছতে প্রায় ছয়টা দশ বেজে গেল।

ক্লোক রুমে লাগেজ নিতে গিয়ে চক্ষু চড়কগাছ। দরজায় দেখি তালা ঝুলছে। শিফটিং ডিউটিতে যিনি জয়েন করেছেন তিনি তালা ঝুলিয়ে চলে গেছেন। সঙ্গে সঙ্গে স্টেশন মাস্টার কে জানানো হল। তিনি তাকে ফোন করে আসতে বললেন। আমাদের হাতে আর দশ মিনিট সময়। ট্রেন স্টেশনে এসে দাঁড়িয়ে রয়েছে। আমাকে, বান্ধবী শুভ্রা, বন্ধু জয়ের বৌ রুমকীকে বলা হল বাচ্চা তিনটিকে নিয়ে ওভার ব্রিজ পেরিয়ে ট্রেনের কাছে গিয়ে দাঁড়াতে। ওরা লাগেজ নিয়ে আসছে। দেবাংশীর পায়ে লেগেছে ও তাড়াতাড়ি হাঁটতে পারবেনা। আমরা ট্রেনের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে, সাড়ে ছটা বাজতে দু মিনিট বাকি, ঠাণ্ডাতেও আমরা কুলকুল করে ঘামছি, লাগেজ নিয়ে

ওরা তখনো পৌঁছায়নি। মনে মনে ভাবছি আমাদের নৈনিতাল যাওয়া আর বোধ হয় হল না। ট্রেনে অ্যানাউন্সমেন্ট হচ্ছে 'দরোওজা বন্ধ হো রাহা হে'। আর এক মিনিট সময়। এমন সময় শুভাশীষ ওভার ব্রীজের ওপর থেকে চিৎকার করে বলছে তোমরা উঠে পড়। জয় ইতিমধ্যে নিচে নেমে আমাদেরকে উঠিয়ে দিয়েছে। শুভাশীষ প্রায় চলে এসেছে। ট্রেন ছাড়ছে, জয় বুদ্ধি করে পা দিয়ে দরজা আটকে রেখেছে, বাচ্চাগুলো ভয়ে তারস্বরে কান্না শুরু করে দিয়েছে। আমরাও চেঁচামেচি শুরু করে দিয়েছি। শুভাশীষ ট্রেনে উঠলেও সুজয় তখনো উঠতে পারে নি। বাবা আসেনি দেখে পাপালি চিৎকার করে কাঁদতে আরম্ভ করলো। শুভ্রা দিশেহারা হয়ে ট্রেনের চেন টেনে দিল। ট্রেন থেমে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে সারা ট্রেনে হুলুস্থুল অবস্থা। কোন কোচ থেকে কে চেন টানলো? এর মধ্যে সুজয়দা অন্য দরজা দিয়ে ট্রেনে উঠে পড়েছে। সব টিটি আমাদের কোচে এসে জিজ্ঞেস করছে কে চেন টেনেছেন? শুভ্রা তখন বুদ্ধি করে বলে, 'আমার বাচ্চা ট্রেনে উঠতে গিয়ে প্লাটফর্মে পড়ে গেছিল। ট্রেন ছেড়ে দিচ্ছে। আমি ভয় পেয়ে যাই। নিরুপায় হয়ে ছেলেকে তোলার জন্য চেন টানতে বাধ্য হই।' তারপর কয়েকজন টিটি সুজয়দা ও শুভাশীষকে বললেন একটু স্টেশন মাস্টার এর কাছে চলুন। কিছু কাগজে সই করতে হবে। আমাদের ডকুমেন্টস রাখতে হবে। এই সব করতে করতে ট্রেন প্রায় এক ঘণ্টা দেরিতে ছাড়ল। তারপর আমরা নিজেদের সিট নম্বর খুঁজে নিয়ে বসে পড়লাম। আমাদের চেয়ারকারের টিকিট কাটা ছিল। যথা সময়ে আমরা লক্ষ্নৌ পৌঁছালাম। রাত সাড়ে এগারোটায় কাঠগুদাম এক্সপ্রেসে চাপলাম নৈনিতাল যাওয়ার উদ্দেশ্যে। পরের দিন ভোর ভোর আমরা পৌঁছে গেলাম কাঠগুদাম স্টেশনে। ওখানে ওয়েটিং রুমে সকাল হওয়ার অপেক্ষায় অপেক্ষা করতে লাগলাম। সকাল হলেই আমরা গাড়ি ঠিক করে বেরিয়ে পড়লাম উত্তরাখণ্ডের মনোরম পাহাড়ি শহর নৈনিতালের উদ্দেশ্যে।

শৈলশহর নৈনিতাল সম্পর্কে আমার অনেক দিনের স্বপ্ন জড়িয়ে আছে। পাহাড় ঘেরা নৈনি লেকে বোটিং করার জন্য মনটা উৎসুক হয়েছিল। রাস্তায় যেতে যেতেই আমরা ঠিক করে ফেললাম এরপর আমরা কোথায় কোথায় যাব। ড্রাইভার আবার বললেন মুন্সিয়ারিতে এত বরফ পড়ছে যে রাস্তা বন্ধ হয়ে গেছে। শুনে আমাদের মন খারাপ হয়ে গেল। ডিসেম্বরে প্রচুর বরফ পাওয়া যায় বলেই এই ঠাণ্ডায় আমাদের নৈনিতাল আসা। আমাদের মত সমতলের বাসিন্দাদের কাছে বরফ মানেই প্রবল আবেগ। ঠিক এই সময় শুভ্রা বলে উঠলো 'ভাগ্যিস আমি ট্রেনের চেন টেনে ছিলাম। নইলে নৈনিতালে আর আসা হত না।' ওর অনেক দিনের ইচ্ছে ছিল ট্রেনের চেন টানার। সেটা এভাবে পূরণ হবে আশা করেনি। সেদিন সকালে নৈনিতালে পৌঁছে ঠিক হল সেদিনই ওখানকার সাইট সিন করে পরের দিন আলমোড়া, রানীক্ষেত হয়ে চকৌরী পৌঁছাব। বিকেল বিকেল যখন আমরা নৈনি লেকে পৌঁছালাম, আবহাওয়া বেশ খারাপ হয়ে গেল। আকাশে মেঘ করেছে, কনকনে ঠান্ডা হাওয়া বইছে। শীতের পোশাকের ওপর দিয়ে যেন সেই হাওয়া কাঁটার মত বিঁধতে লাগলো। লেকের জলে ভাসমান বোট গুলো প্রবল বেগে দুলছিল।

আমাদের হাতে সময় বেশি না থাকায় এর মধ্যেই তিনজন করে এক একটি বোটে উঠে পড়লাম। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করার থেকেও তখন যেন ভয় বেশি করছিল। বোটম্যান যিনি হাতে দাঁড় টানছিলেন, তিনিও বললেন এইরকম পরিস্থিতিতে বেশি দূর যাওয়া ঠিক হবে না ম্যাডাম। তাই খুব তাড়াতাড়ি আমরা ঘাটের কাছে ফিরে এসে নেমে পড়লাম। তখন আবার গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়তে শুরু করল। হাড় কাঁপানো ঠান্ডা হাওয়া তার ওপর বৃষ্টি আমাদেরকে কাবু করে তুলল। সোজা হয়ে দাঁড়ানোই কঠিন হয়ে উঠছিল। এত ঠান্ডা তবুও নৈনি লেকের ধারে দাঁড়িয়ে একটা ছবি তোলা হবে না তাই কি হয়। প্রায় কাঁপতে কাঁপতেই একটা গ্রুপ ছবি হয়ে গেল। সবাই ঠিক করলাম বাচ্চাদের নিয়ে এই ঠান্ডায় বাইরে থাকা আর ঠিক হবে না। হোটেলে ফিরে যেতে হবে। আমি শুনেছিলাম নৈনি লেকের ধারে শীতের পোশাকের মার্কেটটি খুব বড় এবং বেশ সস্তায় শীতের পোশাক পাওয়া যায়। আমার

ইচ্ছে ছিল এখান থেকে কিছু মার্কেটিং করার। কিন্তু হায়রে আমার মার্কেটিং! শীতের কামড়ে হোটেলে ফিরতে বাধ্য হলাম। হোটেলে ফিরে গরম গরম কফি খেয়ে একটু আরামবোধ হল।

পরের দিন সকাল বেশ ঝকঝকে। সূর্যদেব নৈনী লেকের শিয়রে থাকা পাহাড়ের মাথায় সহাস্যে উপস্থিত। যেন অভয় দিয়ে বলছেন, এগিয়ে যাও হে। ওই তো সামনেই আলমোড়া, রানীক্ষেত, চকৌরী। স্বপ্নের পাহাড়। স্বপ্নের সফর। সকাল সকাল আমাদের তল্পিতল্পা গুছানো শেষ। হোটেলের দোরগোড়ায় গাড়ি তৈরি। আমরা বেরুবো, এমন সময় শুভ্রা হাউমাউ করে আমাদের হোটেলের ঘরে এসে উপস্থিত। পিছনে পিছনে সুজয়দা। খুবই উত্তেজিত। শুভ্রা কান্নাকাটি শুরু করেছে।আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'আরে কি হয়েছে বল তো। পাপালি ঠিক আছে? কিছু হয় নি তো?'সুজয়দা, 'এই দ্যাখো, আমার মোবাইলে কি মেসেজ এসেছে?'

আমি বললাম, 'কি এমন মেসেজ এসেছে, যে শুভ্রা কান্নাকাটি শুরু করল? কোনও খারাপ খবর? বাড়ির কোনও খবর?'সুজয়দা, 'আরে আগ্রা স্টেশনের GRPF থেকে নোটিশ এসেছে। তাই দেখে ও কান্নাকাটি শুরু করেছে।''কিসের নোটিশ?' আমি বললাম।সুজয়দা, 'আরে ঐ যে আমরা ট্রেনের চেন টেনেছিলাম না, সেই নোটিশ। পরশু দুপুরের মধ্যে আমাকে ওখানে হাজিরা দিতে হবে। জরিমানা দিতে হবে। নইলে জেল হয়ে যাবে।''অ্যা! জেল? সে কি? কেন?'শুভ্রা জোরে কান্না করে ওঠে। ওকে থামানোই যাচ্ছে না। ওর বরকে পুলিশে ধরে নিয়ে যাবে। বাঁচানো যাবে না। সবই ওর নির্বুদ্ধিতার জন্য হয়েছে। এইসব বলেই চলেছে।জয়দের পরিবার হৈহট্টগোল শুনে চলে এসেছে। আমরা কিছুতেই শুভ্রাকে থামাতে পারছি না। সুজয়দাকে আগ্রাতে ফিরতে হবে মানে, আমাদেরও ফিরতে হবে। তবে কি আমাদের নৈনিতাল ভ্রমণের এখানেই ইতি? মনটা খারাপ হয়ে গেলো। কি আশ্চর্য। নৈনী লেকের ওপরেও ঘনকালো মেঘ। পাহাড়ের মাথায় সূর্যদেবকেও ঢেকে দিয়েছে। আমাদের আচমকা ছুটি হয়ে যাওয়া পাহাড়ের দুঃখ, বৃষ্টি হয়ে ঝরে পড়ছে লেকের জলে। আমি অস্ফুটে বলে উঠলাম, 'বিদায় নৈনিতাল। ভাগ্য সুপ্রসন্ন থাকলে আবারও দেখা হবে।'

ভালোবাসার কারাগার

লালন সেখ (পঞ্চম সেমিস্টার)

দেখো তুমি কত দূরে
তবুও কেন আমার হলে
পারতে তুমি করতে আপন
নিজের মনেও ব্যথা নিলে
হঠাৎ করে পড়লো মনে
তুমি তো বেশ ভালোই ছিলে
বলতে না হয় নিজের কথা
আমি যে তোমার জেলে
অনেক ভালো লাগতো আমার
তোমার কোলে মাথা দিলে
আমি যে শুধু বন্দী তোমার জেলে।

জাতীয়তাবাদী সংগঠক পন্ডিত লক্ষ্মীকান্ত মৈত্রের আদর্শ ও কর্মকান্ড

ড. সুদীপ্ত সাধুখাঁ (সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ)

নদিয়া জেলার যেসকল সমাজ সংগঠক ও রাজনীতিবিদ একই সঙ্গে স্বাধীনতা পূর্ব ও স্বাধীনতা উত্তর জাতীয় এবং স্থানীয় ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন লক্ষ্মীকান্ত মৈত্র। লক্ষ্মীকান্ত মৈত্রের পিতা রজনীকান্ত মৈত্র নদীয়ার বেলপুকুর গ্রাম থেকে ১৮৮৬ সালের শান্তিপুরে এসে বসবাস শুরু করেন। তিনি ছিলেন একটি পাট ব্যবসার সাথে যুক্ত একটি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের কর্মী। ১৮৯৫ সালে রজনীকান্ত মৈত্রের চতুর্থ তথা কনিষ্ঠ পুত্র লক্ষ্মীকান্ত মৈত্রের জন্ম হয়। নারায়ণগঞ্জ স্কুল থেকে প্রথম বিভাগে এনট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর, তিনি ঢাকা জগন্নাথ কলেজ থেকে এফ.এ. ও বি.এ. সম্পন্ন করেন। বিশেষ করে ইংরেজিতে সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপ্তির জন্য তাঁকে স্বর্ণপদকে ভূষিত করা হয়েছিল। পরে তিনি কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ১৯১৭ সালে দর্শনে এম.এ. এবং ১৯১৯ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইনের স্নাতক হন। সংস্কৃত কাব্য ও সাংখ্য বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান অর্জনের জন্য তিনি ''পণ্ডিত'' উপাধিতে ভূষিত হন।

তাঁর কর্মজীবনের সূচনা হয় ১৯২০ সালে আলিপুর আদালতে আইনজীবী হিসেবে। তবে খুব শিগগিরই তিনি মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনের প্রতি সাড়া দিয়ে ওকালতি ত্যাগ করেন। এরপর শান্তিপুরে ফিরে তিনি ''শিল্প আশ্রম'' নামে একটি প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেন, যেখানে বিভিন্ন গৃহস্থালি সামগ্রী যেমন দাঁতের মাজন, লেখার কালি, জুতো পালিশের কালি এবং কবিরাজী তেল ইত্যাদির উৎপাদন শুরু হয়। তবে এর পরবর্তী সময়ে মৈত্র কৃষ্ণনগরে এসে পুনরায় আইন পেশায় ফিরে যান।

ত্রিশের দশকের গোড়ার দিকে, লক্ষ্মীকান্ত মৈত্র সক্রিয় রাজনীতিতে প্রবেশ করেন। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ডের সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারার প্রস্তাবের বিরুদ্ধে কংগ্রেসের অভ্যন্তরে গঠিত ''কংগ্রেস জাতীয় দল''-এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে তিনি ১৯৩৪ সালে কেন্দ্রীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। এই পরিষদে তিনি দলের সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন এবং ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত তিনি এই পদে বহাল ছিলেন। ব্রিটিশ শাসনের শেষ পর্যায়ে, ১৯৪৬ সালে ব্রিটিশ সরকার ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রস্তুতির অংশ হিসেবে কেন্দ্রীয় আইনসভাকে অস্থায়ী পার্লামেন্টে রূপান্তরিত করে। মৈত্র সেই অস্থায়ী পার্লামেন্টের সদস্য নির্বাচিত হন, যা স্বাধীনতার পর গণপরিষদে রূপান্তরিত হয়। গণপরিষদে ড. বি.আর. আম্বেদকরের নেতৃত্বাধীন সংবিধান রচনা কমিটির অন্যতম সদস্য হিসেবে মৈত্র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এই সময়ে মূলত তিনি সংবিধানে ধর্মীয় স্বাধীনতা এবং ভারতের জাতীয় ভাষার মত বিষয় নিয়ে বিতর্কে অংশগ্রহণ করেছিলেন ।

স্বাধীনতার দিন, ১৫ আগস্ট ১৯৪৭ সালে, লক্ষ্মীকান্ত মৈত্র এবং সুচেতা কৃপালনী লোকসভার উদ্বোধনী অধিবেশনে ''জনগণমন'' ও ''বন্দেমাতরম'' সঙ্গীত পরিবেশন করেন। এছাড়াও, ভারত বিভাজনের সময় যখন নদিয়া জেলার শান্তিপুর ও নবদ্বীপ অঞ্চল পূর্ব পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, তখন মৈত্র এই সিদ্ধান্তের তীব্র প্রতিবাদ জানান। পণ্ডিত নেহরুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তিনি এই অঞ্চলকে হিন্দুদের তীর্থস্থান এবং শ্রীচৈতন্যের সাধনভূমি হিসেবে উল্লেখ করে বলেন, এই সিদ্ধান্ত হিন্দু জনসমষ্টির জন্য গ্রহণযোগ্য নয়। তাঁর প্রচেষ্টার ফলে এই অঞ্চল ভারতভূমির অন্তর্ভুক্ত থাকে।

দেশভাগের পর, পূর্ব পাকিস্তান থেকে আগত অগণিত শরণার্থী পশ্চিমবঙ্গের নদিয়া জেলা ও অন্যান্য অঞ্চলে আশ্রয় নেয়। তাঁদের দুর্দশা এবং আশ্রয়হীন অবস্থার কথা মৈত্র লোকসভায় তুলে ধরেন। পণ্ডিত লক্ষ্মীকান্ত মৈত্রের দীর্ঘ ১৮ বছরের সংসদীয় জীবন ছিল ভারতীয় রাজনীতির এক স্বর্ণালী অধ্যায়, যেখানে তিনি কেন্দ্রীয়

সরকারের বিভিন্ন মর্যাদাপূর্ণ কমিটিতে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি খাদ্যশস্য সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে নেতৃত্ব দেন ১৯৪৯ সালে খাদ্যশস্য তদন্ত কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে। এই কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী, তৎকালীন কেন্দ্রীয় কৃষি ও খাদ্যমন্ত্রী রফি আহমেদ কিদোয়াই খাদ্যশস্যের মুক্ত বাজার নীতি চালু করেন, যা পরবর্তীতে 'কিদোয়াই পরিকল্পনা' নামে পরিচিত হয়। তাঁর কর্মতালিকায় আরও ছিল জনস্বাস্থ্য ও চিকিৎসা খাতে পুনর্গঠনের ব্যাপক ভূমিকা পালন। তিনি All India Health Survey Advisory Committee-র সদস্য ছিলেন, যদিও তিনি পেশাগতভাবে চিকিৎসক ছিলেন না। এটি তাঁর প্রশাসনিক দক্ষতা এবং স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিষয়ে তাঁর গভীর বিচক্ষণতার প্রমাণ বহন করে।

এছাড়াও, পণ্ডিত মৈত্র উদ্বাস্তু পুনর্বাসন সমস্যা সম্পর্কে গভীর অন্তর্দৃষ্টি দেখিয়েছিলেন। বিশেষ করে দেশভাগ-পরবর্তী সময়ে পূর্ব পাকিস্তান এবং পশ্চিম পাঞ্জাব থেকে আগত শরণার্থীদের পুনর্বাসন করার লক্ষ্যে তাঁর নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় সরকার 'Rehabilitation Finance Administration' নামে একটি বিশেষ কমিটি গঠন করে, যার তিনি চেয়ারম্যান ছিলেন। এই কমিটির তত্ত্বাবধানে শরণার্থীদের পুনর্বাসনের জন্য আর্থিক সহায়তা ও পরিকল্পনা প্রণয়নের কাজ সম্পন্ন হয়। মৈত্রের প্রস্তাবিত পরিকল্পনা তৎকালীন মন্ত্রী মেহের চাঁদ খান্নার কাছে উপস্থাপিত হয়, যা পুনর্বাসন নীতির ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা হয়। এই জাতীয় উদ্যোগের মাধ্যমে লক্ষ্মীকান্ত মৈত্র শরণার্থীদের প্রতি তাঁর মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির অসামান্য উদাহরণ রেখেছেন।

তাঁর নেতৃত্বগুণ এবং জ্ঞানের প্রসার ভারতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সংক্রান্ত কমিটিতেও দেখা যায়, যেমন তিনি All India Institute of Science and Technology– Bangalore-র একজন সদস্য ছিলেন। এছাড়াও রেলপথ ব্যবস্থাপনা, ভারতীয় ভূতল সড়ক ও বিভিন্ন প্রযুক্তি ও স্বাস্থ্য সংশ্লিষ্ট উপদেষ্টা বোর্ডে তিনি সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন। রেলওয়ে বোর্ডের সদস্য হিসেবে তাঁর কাজের পরিধি ছিল বিস্তৃত, যেখানে ভারতীয় রেলপথের আধুনিকীকরণ ও সম্প্রসারণে তিনি অসামান্য অবদান রেখেছেন।

ভারতীয় ভাষার মর্যাদা রক্ষার ক্ষেত্রে মৈত্র সংস্কৃত ভাষাকে জাতীয় ভাষার মর্যাদা দেওয়ার প্রস্তাব রেখেছিলেন লোকসভায়। যদিও সেই প্রস্তাব ভোটাভুটিতে প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল, তবুও এটি তাঁর ভাষা-সংক্রান্ত ভাবনাগুলির একটি গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত। ভাষার প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধা ও ঐতিহ্য রক্ষার জন্য তাঁর এই উদ্যোগ ভারতীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রাচীনতা ও আধুনিকতার সমন্বয়ে এক নতুন দিক উন্মোচন করেছিল।

তাঁর ধর্মীয় সহনশীলতার দৃষ্টান্ত বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এম. ডি. পাইলি তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ "Constitutional Government in India"-এ পণ্ডিত মৈত্রের বক্তব্য উল্লেখ করেন, যা ধর্মনিরপেক্ষতার মূলনীতিকে সংজ্ঞায়িত করে।৮তিনি তাঁর ভাষণে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেন যে, ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র মানে হল এমন একটি রাষ্ট্র যেখানে কোনো ধর্মের প্রতি কোনো বৈষম্য থাকবে না, কোনো ধর্ম রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতা পাবে না, এবং কোনো নাগরিক ধর্মীয় পরিচয়ের কারণে বিশেষ সুবিধা বা বৈষম্যের শিকার হবে না। মৈত্রের মতে, রাষ্ট্রের নীতিনির্ধারণে কোনো ধর্মীয় বিশ্বাসকে বিবেচনায় না নেওয়াই প্রকৃত ধর্মনিরপেক্ষতা। পাশাপাশি তিনি দৃঢ়ভাবে সমর্থন করেন যে, প্রত্যেক নাগরিকের ধর্ম পালনের স্বাধীনতাও যেন নিশ্চিত থাকে।

তাঁর জন্মস্থান শান্তিপুরের প্রতি তাঁর অন্যতম বড় অবদান ছিল শান্তিপুর কলেজের প্রতিষ্ঠা এবং একটি ব্রডগেজ রেললাইনসহ একটি রেলওয়ে স্টেশন স্থাপন, যা সেই সময়ের প্রেক্ষিতে শান্তিপুরের পরিকাঠামো এবং অর্থনৈতিক বিকাশে বড় ভূমিকা পালন করে। বিশেষত শান্তিপুর কলেজ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা অনস্বীকার্য। এই কলেজের স্থাপনার প্রাথমিক ধারণা এবং বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে তাঁর অগ্রণী ভূমিকা শান্তিপুরের শিক্ষাক্ষেত্রে এক যুগান্তকারী পরিবর্তন আনে। শান্তিপুরের আর এক বিশিষ্ট ব্যক্তি, অটলবিহারী মৈত্রের বাগানবাড়িতে কলেজের

প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করা হয়, যার জন্য প্রায় ৪৭ বিঘা জমি ক্রয় করা হয়। প্রথমে কলেজের নামকরণ 'অদ্বৈত কলেজ' করার কথা ভাবা হলেও, পরবর্তীতে 'শান্তিপুর কলেজ' নামটি চূড়ান্ত করা হয়। ১৯৪৮ সালের ২২শে জুলাই এই কলেজের আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠা ঘটে, এবং কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্বাস্তু পুনর্বাসন বিভাগ থেকে ১৯৫০ সালে কলেজের প্রশাসনিক ভবন নির্মাণের জন্য ৬০ হাজার টাকা অনুদান মঞ্জুর করা হয়। এই কলেজের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি হিসেবে পণ্ডিত মৈত্র গভর্নিং বডির দায়িত্ব পালন করেন। শান্তিপুর কলেজের প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তাঁর উচ্চশিক্ষা সংশ্লিষ্ট অভিজ্ঞতা এবং দৃষ্টিভঙ্গি আরও প্রসারিত হয়।

পণ্ডিত লক্ষ্মীকান্ত মৈত্রের এই সব অবদান একদিকে যেমন শান্তিপুরের জনজীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন আনে, অন্যদিকে তিনি জাতীয় রাজনীতিতেও এক শক্তিশালী এবং ন্যায়পরায়ণ নেতৃত্বের প্রতীক হয়ে ওঠেন। তাঁর চিন্তা, কর্ম এবং মানবিক মূল্যবোধ আজও আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, একজন প্রকৃত জননেতার দায়িত্ব কেবলমাত্র রাজনৈতিক নয়, বরং সামাজিক, শিক্ষাগত ও মানবিক উন্নয়নের প্রতিও নিবেদিত থাকা উচিত।

সহায়তা

১. সংসদ বাঙালী চরিতাভিধান, শ্রীসুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত ও অঞ্জলি বসু সম্পাদিত, সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা, ১৯৬০

২. সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত ও অঞ্জলি বসু সম্পাদিত, সংসদ বাঙালি চরিতাভিধান, প্রথম খণ্ড, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, আগস্ট ২০১৬

৩. শিবনাথ চৌধুরী সম্পাদিত, কালের মহা পথিক, কালীনগর কো-অপারেটিভ সোসাইটি প্রকাশিত, কৃষ্ণনগর, ২০১৫,

৪. ধর্মীয় স্বাধীনতা এবং ভারতের জাতীয় ভাষার মত বিষয় নিয়ে বিতর্কে অংশগ্রহণ করেছিলেন । https-//www.constitutionofindia.net/members/lakshmi-kanta-maitra/

৫. বরেণ্য দেশপ্রেমিক লক্ষ্মীকান্ত মৈত্র ও যশস্বী চিকিৎসক ডঃ সুব্রত মৈত্র, সম্পাদনা শান্তিপুর মরমী, প্রকাশক জীবন কৃষ্ণ ভট্টাচার্য, তৃতীয় সংস্করণ, ২০২২

৬. The Framing of Indiaós Constitution – SVol 3V – B. Shiva Rao– Indian Institute of Public Administration – July 2021

৭. Constitutional Government in India– M.V. Pylee– S Chand Publishing– Delhi– 2024,

৮. শান্তিপুর কলেজের ইতিবৃত্ত (১৯৪৮-১৯৯৮), অধ্যাপক সলিলকুমার দাশগুপ্ত, শান্তিপুর কলেজ সুবর্ণ জয়ন্তী স্মারক সংকলন, ১৯৯৮,

৯. সাক্ষাৎকার https-//sites.google.com/site/santipurmarami/events/panditalaksmikantamaitrerasmarakabaktrta ২৬-০৭-২০১৭

১০. The Legislative Assembly Debates. Official Report। Vol 1– issue ৬,

১১. আজকের রাজনীতিতে পণ্ডিত মৈত্রের প্রাসঙ্গিকতা, হারাধন চৌধুরী, বর্তমান পত্রিকা, ২৬ জুলাই, ২০২০

১২. একশো পঁচিশে সংসদের বাঙালি পণ্ডিত, হারাধন চৌধুরী, বর্তমান পত্রিকা, ২৩ জুলাই, ২০১৯

শান্তিপুরের শ্যামচাঁদ মন্দিরের ইতিহাস

সৌমেন ঘোষ (ইতিহাস বিভাগ, ষষ্ঠ সেমিস্টার)

শ্যামচাঁদ মন্দির হল পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলার শান্তিপুরে অবস্থিত ১৭২৬ সালে নির্মিত একটি আটচালা শৈলীর হিন্দু মন্দির। তৎকালীনস্থানীয় বস্ত্রব্যবসায়ী রামগোপাল খাঁ চৌধুরী এটি নির্মাণ করেন। এই মন্দিরটি ভগবান কৃষ্ণকে(শ্যামচাঁদ) উৎসর্গ করা হয়েছে এবং এটি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ দ্বারা সংরক্ষিত একটি স্থাপত্য।

শ্যামচাঁদ মন্দিরের অবস্থান নদীয়া জেলার ঐতিহাসিক শহর শান্তিপুরের বড়বাজার। এই বিশাল 'আটচালা' মন্দিরের সামনে একটি আলাদা 'নাটমন্দির' রয়েছে। মন্দিরের গর্ভগৃহে শ্রীকৃষ্ণ (শ্যামচাঁদ) এবং রাধিকার বিগ্রহ রয়েছে। শান্তিপুরের বিখ্যাত রাস উৎসবের সময় এই মন্দিরে বিশেষ সমারোহ দেখা যায়। প্রতি বছর রাস উৎসবের সময় এই মন্দিরে রাধা কৃষ্ণের বিশেষ পুজো করা হয় এবং রাস শেষ হওয়ার পর কালে এই মন্দির প্রাঙ্গণে বড়ো মেলা বসে।

শ্যামচাঁদ মন্দিরে দুর্গাপূজা ও কালীপূজা ব্যতীত সমস্তহিন্দু ধর্মীয় অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। এই মন্দিরের কিছু উল্লেখযোগ্য উৎসব হল - রাস উৎসব, ঝুলন উৎসব, জন্মাষ্টমী ও দোলযাত্রা।এছাড়া প্রত্যেক বছর মাঘ মাসে শ্যামচাঁদ মন্দির থেকেনবদ্বীপ নগর পরিক্রমা হয়।

শ্যামচাঁদ মন্দিরের বৈশিষ্ট্য হল, মন্দিরের প্রবেশ-দ্বারের ওপরে এবং চারপাশের দেওয়ালে চমৎকার টেরাকোটার অলঙ্করণ রয়েছে। এতে রামায়ণ, মহাভারত এবং কৃষ্ণলীলার বিভিন্ন দৃশ্য অত্যন্ত নিপুণভাবে খোদাই করা হয়েছে। মন্দিরের সামনে পাঁচটি খিলান আছে, মধ্যের তিনটি খিলান দিয়ে অলিন্দে প্রবেশ করা যায়। মন্দিরের ভিতরের বিগ্রহ কৃষ্ণমূর্তি কষ্টিপাথরের তৈরি এবং প্রথম অবস্থায় রাধার মূর্তিটি ছিল সোনার। আটচালা মন্দিরের গঠন সাধারণত মাঝারি মাপের হয়, কিন্তু শ্যামচাঁদ মন্দিরটি এর বিশাল আকৃতির জন্য পরিচিত, যা দূর থেকে সহজেই নজরে আসে।

শ্যামচাঁদ মন্দিরের সাংস্কৃতিক গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। শান্তিপুরকে একসময় দ্বিতীয় নবদ্বীপ বলা হতো। অদ্বৈত আচার্যের স্মৃতি বিজড়িত এই জনপদে শ্যামচাঁদ মন্দিরটি বৈষ্ণব ধর্মের প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে।আজও শান্তিপুর তার তাঁতশিল্পের পাশাপাশি এই ধরণের প্রাচীন মন্দিরের জন্য পর্যটকদের কাছে আকর্ষণীয়। শ্যামচাঁদ মন্দিরটি শান্তিপুরের একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যটন দ্রষ্টব্য। মন্দিরটি তার সুন্দর পোড়ামাটির নকশা এবং ঐতিহাসিক গুরুত্বের জন্য বিখ্যাত।

সহায়ক গ্রন্থাবলি :

১. নদীয়া জেলার পুরাকীর্তি : মোহিত রায়
২. বাংলার মন্দির স্থাপত্য ও ভাস্কর্য : প্রণব রায়

শান্তিপুরের বাবলা অদ্বৈত পাট : ইতিহাস ও ঐতিহ্যের মহাপীঠ

স্নেহলতা বসাক (ইতিহাস বিভাগ, ষষ্ঠ সেমিস্টার)

''নবদ্বীপ যদি শ্রীচৈতন্যের প্রকাশ ভূমি হয়, তবে শান্তিপুরের বাবলা হলো তাঁর আবাহনভূমি।'';
কুমুদনাথ মল্লিক ('নদীয়া কাহিনী' - ৩১৪-৩১৫ পৃষ্ঠা)

ঐতিহাসিক কুমুদনাথ মল্লিক শান্তিপুরের ঐতিহ্যবাহী বাবলা অদ্বৈত পাটের গুরুত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে তাঁর কালজয়ী 'নদীয়া কাহিনী' (১৯১০ খ্রী.) গ্রন্থে এই বিখ্যাত উক্তিটি করেন। আজ থেকে প্রায় পাঁচশো বছরেরও বেশি সময় আগে প্রাচীন সুরধনী গঙ্গার তীরের এই নির্জন ভূমিই ছিল মধ্য যুগের বাংলার ভক্তি আন্দোলনের প্রধান কেন্দ্র। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য দেবের আবির্ভাবের নেপথ্যে যে মহাপুরুষের অলৌকিক তপস্যা নিহিত ছিল, সেই শ্রী অদ্বৈত আচার্যের প্রধান সাধনা ক্ষেত্র হল এই বাবলা।

বাবলা অদ্বৈত পাট প্রতিষ্ঠার ইতিহাস শ্রী অদ্বৈত আচার্যের (১৪৩৪-১৫৫৮ খ্রী.) জীবন ও সাধনার সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত। তাঁর সমসাময়িক ঈশান নাগর রচিত 'অদ্বৈত প্রকাশ' (১৫৬৮ খ্রী.) গ্রন্থানুসারে, ১৪৮০-র দশকের মাঝামাঝি সময়ে তিনি প্রতিদিন এই স্থানে গঙ্গাজল ও তুলসী দিয়ে শালগ্রাম শিলার আরাধনা শুরু করেন। ভক্তদের বিশ্বাস তাঁর এই ব্যাকুল প্রার্থনার ফলেই ১৪৮৬ খ্রী. ফাল্গুনী পূর্ণিমায় নবদ্বীপে শ্রী শচী মাতার কোলে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব ঘটে। ('অদ্বৈত প্রকাশ' - ৮৪ পৃষ্ঠা)

বাবলা অদ্বৈত পাটের ইতিহাসে সবচেয়ে স্মরণীয় সাল হল ১৫১০ খ্রী.। কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত' (১৬১৫ খ্রী.) অনুযায়ী ১৫১০ খ্রী. কাটোয়ায় কেশব ভারতীর কাছে সন্ন্যাস গ্রহণের পর মহাপ্রভু যখন বৃন্দাবনের পথে রওনা হন, তখন নিত্যানন্দ প্রভু কৌশল করে তাঁকে শান্তিপুরের অদ্বৈত পাঠে নিয়ে আসেন। দীর্ঘ বিরহের পর এখানেই অদ্বৈত আচার্য ও শচী মাতার সঙ্গে মহাপ্রভুর ঐতিহাসিক মিলন ঘটে। 'চৈতন্য চরিতামৃত' গ্রন্থে মধ্য লীলায় বর্ণিত হয়েছে যে, মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণের পর যখন বাবলার অদ্বৈত পাটে আসেন তখন অদ্বৈত আচার্য তাঁকে বলেছিলেন; ''তুমি যে সন্ন্যাসী হয়েছ, তা আমার এই বাবলার ভজন কুটিরে এসে সার্থক হলো।'' এ সময় মহাপ্রভু এখানে ১০ দিন অবস্থান করেছিলেন এবং অদ্বৈত পত্নী সীতাদেবীর হাতে ৫৬ ভোগ গ্রহণ করেছিলেন যা শান্তিপুরের এক অন্যতম ঐতিহ্য। 'শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত' গ্রন্থে কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখেছেন;

''অদ্বৈত আচার্য গোসাঞি ভক্ত-অবতার।
তাঁর মহিমা লোকে নাহি জানি পার।।'' ('চৈতন্য চরিতামৃত' - ১২২পৃষ্ঠা)

উনবিংশ শতাব্দীতে অদ্বৈত আচার্যের দশম পুরুষ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী এই স্থানের লুপ্তপ্রায় মহিমা পুনরুদ্ধার করেন। কথিত আছে তিনি মাটি খুঁড়ে অদ্বৈত আচার্যের নামাঙ্কিত বোগনা, খড়ম ও কমণ্ডলু পান যা শ্রী মন্দিরের বেদিতলে প্রোথিত করে রাখেন। এপ্রসঙ্গে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী বলেছিলেন;''বাবলা অদ্বৈত পাট হল সেই স্থান, যেখানে ভক্তির টানে ভগবানকে বাধ্য হতে হয়েছিল ধরা দিতে।''

এখানে মূল মন্দিরে অদ্বৈত আচার্য ও সীতাদেবীর বিগ্রহ বিদ্যমান। মন্দিরটি হরিদাস ঠাকুরের সঙ্গেও সম্পর্কিত। পাশেই রয়েছে ঐতিহাসিক 'বকুল তলা', যেখানে মহাপ্রভু ও অদ্বৈত প্রভু বিশ্রাম নিতেন। তবে বর্তমানে বকুল গাছটি আর নেই। এর পাশে রয়েছে একটি প্রাচীন নিম বৃক্ষ। বর্তমান মন্দিরটি বাংলার প্রচলিত আটচালা রীতিতে নির্মিত ও সামনে একটি নাট মন্দির রয়েছে। মন্দিরটির চারপাশে আম্রকানন রয়েছে। এখানকার পরিবেশ শান্ত ও নিবিড়। কুমুদনাথ মল্লিক তাঁর 'নদীয়া কাহিনী' গ্রন্থে অদ্বৈত পাটকে শান্তিপুরের গুপ্ত বৃন্দাবন বলেছেন। বর্তমানে সরকারি ও স্থানীয় উদ্যোগে এই হেরিটেজ সাইটটি রক্ষণাবেক্ষণ করা হচ্ছে।

আধুনিক যুগেও বাবলা অদ্বৈত পাট তার আধ্যাত্মিক গাম্ভীর্য ও ঐতিহাসিক গুরুত্ব হারায়নি। তাই আজও বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অগণিত বৈষ্ণব ভক্তরা ছুটে আসে মহাপ্রভুর চরণাশ্রিত এই অদ্বৈত পাটে। শান্তিপুরের সমাজ জীবনে এই মন্দিরের প্রভাব অপরিসীম। এখানে প্রতিবছর অদ্বৈত সপ্তমী, দোল, জন্মাষ্টমী উপলক্ষে আগত ভক্তদের জন্য 'মহাপ্রসাদ' বিতরণের রীতি রয়েছে। এখানে নিয়মিত নাম সংকীর্তন চলে। এই হেরিটেজ সাইটটি রক্ষা করা এবং এর ইতিহাস আগামী প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেওয়া আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। পর্যটন ও গবেষণার ক্ষেত্রেও এই স্থানের গুরুত্ব অপরিসীম।

গ্রন্থপঞ্জি:-

১. 'অদ্বৈত প্রকাশ' , ঈশান নাগর (আনুমানিক ১৫৬৮ খ্রী. অমিয় নিমাই চরিত / রিফ্লেক্ট পাবলিকেশন)
২. 'নদীয়া কাহিনী' , কুমুদনাথ মল্লিক (১৯১০ খ্রী. দে'জ পাবলিশিং)
৩. 'চৈতন্য চরিতামৃত' , কৃষ্ণদাস কবিরাজ (১৬১৫ খ্রী. অক্ষয় লাইব্রেরি / দে'জ পাবলিশিং)

শান্তিপুরের সূত্রাগড় অঞ্চলের জগদ্ধাত্রী পূজার ইতিহাস

সৌম্যদীপ দাস (ইতিহাস বিভাগ, ষষ্ঠ সেমিস্টার)

শান্তিপুর শহর ছাড়িয়ে দশ কিলোমিটার দূরে এক প্রাচীন জনপদ ব্রহ্মশাসন। এক সময় এখান দিয়ে প্রবাহিত হত ভাগীরথী নদী। কালের নিয়মে সেই ভাগীরথী অবশ্য গতিপথ বদলেছে। শান্তিপুরের এই প্রত্যন্ত জায়গাটা জেগে ওঠে জগদ্ধাত্রী পুজো এলে।

কথিত আছে নদীয়ারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের হাত ধরেই নদিয়ায় প্রথম জগদ্ধাত্রী পূজার সূচনা হয়। তাঁরই পৌত্র গিরিশচন্দ্র রায় তাঁর জমিদারির অন্তর্ভুক্ত শান্তিপুরের হরিপুর গ্রামের পার্শ্ববর্তী এই অঞ্চলে ১০৮ ঘর ব্রাহ্মণ পরিবারকে বসবাসের জন্য দেন, আর তা থেকেই এই গ্রামের নাম হয় ব্রহ্মশাসন।

এই প্রসঙ্গে বলতে গেলে ফিরে যেতে হয় সাড়ে তিনশো বছরের পুরোনো ইতিহাসের স্মৃতিতে। ১৭১৫ থেকে ১৭২৮ সাল পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন নদীয়ারাজ রঘুরাম রায়, এরপর ১৭২৮ সালে নদীয়ার রাজা হন কৃষ্ণচন্দ্র রায়। কৃষ্ণনগর রাজবাড়িতে তখন আড়ম্বরের সাথেই পূজিতা হতেন দেবী দুর্গা, যিনি রাজরাজেশ্বরী নামে পরিচিত। ১৭৫৭ সালের পলাশীর যুদ্ধে মীরজাফরকে সর্বতোভাবে সাহায্য করেন নদিয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র। ১৭৬০ সালে মীরজাফরকে সরিয়ে যখন বাংলার মসনদ দখল করেন তাঁর জামাতা মীরকাশিম, তখন তাঁর সাথে বিরোধ বাঁধে। নদিয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের নবাবের বকেয়া কর পরিশোধ করতে না পারার কারণে মীরকাশিম বন্দী করেন রাজা কৃষ্ণচন্দ্রকে এবং তাঁকে পাঠানো হয় বিহারের মুঙ্গের দুর্গে।

১৭৬৩ সালে রাজনৈতিক অস্থিরতার সুযোগ নিয়ে পালিয়ে আসেন রাজা কৃষ্ণচন্দ্র। ফেরার সময় জলপথে কৃষ্ণনগরের উদ্দেশ্যে রওনা দেন। দশমীর দিন দেখেন দুর্গাপ্রতিমা নিরঞ্জন। দেবীর পুজো না করতে পারার কারণে খুবই ব্যথিত হন রাজা কৃষ্ণচন্দ্র এবং সেই রাতেই কৃষ্ণনগর রাজবাড়িতে পৌঁছে রাজা স্বপ্নাদেশ পান। খুদে বালিকার রূপে দেবী আদেশ দেন আগামী শুক্লা নবমী তিথিতে দেবীর পূজার আয়োজন করতে হবে এবং সেই দেবীর নাম হবে জগদ্ধাত্রী।

জানা যায় সেই সময় রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের কাছে দেবী জগদ্ধাত্রীর রূপের কোনো ধারনা না থাকার কারনে ১৭৬৩ সালে তাঁর হাত ধরেই কৃষ্ণনগর রাজবাড়িতে প্রথম পূজা হয় মঙ্গল ঘটের মাধ্যমে। পরবর্তীকালে কৃষ্ণনগর

রাজসভায় সভাপণ্ডিতের পদ অলংকৃত করতেন চন্দ্রচূড় তর্কালঙ্কার (তর্কচূড়ামনি), ১০৮ ঘর ব্রাহ্মণদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। তিনি ব্রহ্মশাসনে বসবাস করতেন এবং পঞ্চমুণ্ডির আসনে তন্ত্রসাধনা করতেন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র চন্দ্রচূড় তর্কালঙ্কারকে দায়িত্ব দেন তন্ত্রসাধনার মাধ্যমে দেবী জগদ্ধাত্রীর রূপের সন্ধান এবং পূজার জন্য প্রয়োজনীয় পদ্ধতি এবং মন্ত্রের অন্বেষণের।

এরপর ধ্যানে বসেন চন্দ্রচূড়। ধ্যানে বসে একদিন ব্রহ্ম মুহূর্তে দেবীর মৃন্ময়ী রূপের দর্শন পান তিনি। সেই দেবীর গাত্রবর্ণ ছিল অর্থাৎ নবোদিত সূর্যের রং এবং তিনি চতুর্ভুজা। কথিত আছে সেই পুজোর পদ্ধতি এবং মন্ত্রের হদিশ পান চন্দ্রচূড়। পরে সেই পদ্ধতি মেনেই দেবীর মৃন্ময়ী রূপ সৃষ্টি করে তিনি শান্তিপুরের হরিপুর গ্রামের ব্রহ্মশাসনে পুজো শুরু করেন। এরপর ১৮০৩ সাল থেকে কৃষ্ণনগর রাজবাড়িতেও মৃন্ময়ী মূর্তিতে দেবীর আরাধনা হয়ে আসছে।

পরবর্তীকালে চন্দ্রচূড় তর্কালঙ্কারের সেই পদ্ধতি অনুসরণ করেই সেই চিরাচরিত পরম্পরা মেনেই পুজো হয়ে আসছে ব্রহ্মশাসন সহ শান্তিপুর সূত্রাগড় এর বিভিন্ন অঞ্চলে। এভাবেই কৃষ্ণনগর রাজবাড়ির নাট মন্দির থেকে শুরু করে পরবর্তীতে এই পুজো ছড়িয়ে পড়ে শান্তিপুর, চন্দননগর থেকে বাংলার এবং বাংলার বাইরের আপামর বাঙালি সমাজের কাছে।

কথিত আছে হরিপুর গ্রামাঞ্চলের নিকটবর্তী এই ব্রহ্মশাসন অঞ্চলে আনুমানিক তিনশো বছর পূর্বে মড়ক লাগে। সেই সময় ওই অঞ্চলের ব্রাহ্মণ পরিবারগুলি যত্রতত্র ছড়িয়ে পড়ে আর তখনই তাঁরা তাঁদের পূজিতা দেবী জগদ্ধাত্রীর পাটটি সূত্রাগড় চড়কতলা অঞ্চলের চড়কের মাঠে রেখে যান, সেই থেকেই সূত্রাগড় হরিপুর স্ট্রিট, বিশ্বাস পাড়া, ও চড়কতলা এই তিন পাড়ার অধিবাসী বৃন্দ কার্তিক মাসের শুক্লা নবমী তিথিতে ওই পাটেই দেবীর মৃন্ময়ী রূপ বানিয়ে পুজো শুরু করেন। পরবর্তীকালে তাঁরা ওখানেই দেবীর বারোয়ারি মন্দিরও স্থাপন করেন। কৃষ্ণনগরের পুজোর দিনেই অর্থাৎ কার্তিক মাসের শুক্লা নবমী তিথিতে শান্তিপুর সূত্রাগড় অঞ্চলে জগদ্ধাত্রীর আরাধনা হয় প্রতিবছর এবং বহুযুগের পরম্পরা মেনে কৃষ্ণনগরের প্রতিমা বিসর্জনের পরদিন বিসর্জন হয় শান্তিপুর সূত্রাগড়ের সব জগদ্ধাত্রী প্রতিমার। এ প্রসঙ্গে কথিত আছে যে, কৃষ্ণনগরের জগদ্ধাত্রী পুজোর পরদিন যাতে এঁনারা শান্তিপুর সূত্রাগড় অঞ্চলের জগদ্ধাত্রী প্রতিমা দর্শন করার সুযোগ পান সেহেতু রাজপরিবারের হস্তক্ষেপে দশমীতে বিসর্জনের পরিবর্তে একাদশীতে শান্তিপুরের সূত্রাগড় অঞ্চলের সব জগদ্ধাত্রী পুজোর বিসর্জনের রীতি চালু হয় এবং সেই রীতি আজও সমানভাবে চলে আসছে।

তথ্যসূত্র -

কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, শান্তিপুর পরিচয়, স্বপ্রকাশিত,১৯৪২, কলকাতা

বাগআঁচড়া গ্রামের বাগদেবী মন্দির: শাক্ত সাধনা ও লোকায়ত বিশ্বাসের এক অনন্য মেলবন্ধন

পূর্ণিমা অধিকারী (ইতিহাস বিভাগ, ষষ্ঠ সেমিস্টার)

নদীয়া জেলার শান্তিপুর ব্লকের অন্তর্গত বাগআঁচড়া গ্রাম তার প্রাচীন ঐতিহ্য এবং লোকসংস্কৃতির জন্য এক বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। গঙ্গার পলিবিধৌত সবুজ গাছপালায় ঘেরা এই গ্রামটি বহু শতাব্দী ধরে শাক্ত ও বৈষ্ণব ধর্মের এক অপূর্ব সমন্বয়ক্ষেত্র। এই অঞ্চলের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক মেলবন্ধনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হলো প্রাচীন 'বাগদেবী মন্দির'। আনুমানিক ৫০০ থেকে ৬০০ বছরের প্রাচীন এই উপাসনালয়টি কেবল একটি ধর্মীয় স্থান নয়, এটি এই অঞ্চলের মানুষের সামাজিক ও ঐতিহাসিক বিবর্তনের এক জীবন্ত দলিল।

সাধারণভাবে 'বাগদেবী' (বাক্ দেবী) বলতে বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতীকে বোঝানো হয়। বহিরাগতরা নামের সাদৃশ্য দেখে এটিকে দেবী সরস্বতীর মন্দির মনে করলেও, স্থানীয় ইতিহাস ও পুরোহিতদের বংশপরম্পরায় প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে এই দেবী কোনোভাবেই বিদ্যার দেবী নন।

মূলত 'বাগ' শব্দটি এখানে সংস্কৃত 'বাক্' (বিদ্যা) থেকে আসেনি, বরং এটি এসেছে 'বাঘ' বা 'ব্যাঘ্র' শব্দ থেকে। প্রাচীনকালে বাংলার এই বনাঞ্চলে বাঘের প্রবল উপদ্রব ছিল। বাঘের হাত থেকে রক্ষা পেতে স্থানীয় মানুষেরা 'ব্যাঘ্র বাহিনী' দেবী দুর্গার আরাধনা শুরু করেন। স্থানীয় গ্রামীণ কথ্য ভাষায় 'বাঘ'-এর দেবী লোকমুখে রূপান্তরিত হয়ে 'বাগদেবী'-তে পরিণত হয়েছে। অর্থাৎ, বাগদেবী এখানে সম্পূর্ণরূপে দেবী দুর্গার একটি বিশেষ রূপ। মূল ধারার শাস্ত্রীয় দেবতা কীভাবে লোকায়ত প্রভাবে স্থানীয় রূপ পরিগ্রহ করেন, ভাষাতাত্ত্বিক দিক থেকে এটি তার এক অনবদ্য দৃষ্টান্ত।

বাগদেবী মন্দিরের উপাসনা পদ্ধতি বাংলার প্রচলিত প্রতিমা পূজার থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। এখানে দেবীর কোনো মৃন্ময় বা মাটির মূর্তি পূজিত হয় না। একটি প্রাচীন বটবৃক্ষের নিচে উন্মুক্ত বেদীতে দেবীর আরাধনা করা হয়। এই মন্দিরের গর্ভগৃহে মূলত তিনটি প্রধান ঘট এবং তিনটি শিলা উপাস্য হিসেবে পূজিত হয়, যা তন্ত্র ও শাক্ত সাধনার এক গভীর তাৎপর্য বহন করে।

- তিনটি প্রধান ঘট: বেদীতে স্থাপিত তিনটি ঘট হল যথাক্রমে; দক্ষিণাকালী, তারামা এবং ব্যাঘ্র বাহিনী দেবী দুর্গা (যাঁকেই স্থানীয়রা বাগদেবী বলেন)।
- তিনটি শিলা বা প্রস্তরখণ্ড: ঘটের পাশাপাশি যে তিনটি প্রাচীন পাথর পূজিত হয় সেগুলি হল; মহাকাল, বটুক ভৈরব এবং দেবী ষষ্ঠী।

এখানে বটুক ভৈরবের উপস্থিতি মন্দিরটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়। স্থানীয় লোকশ্রুতি দাবি করে যে, ভারতবর্ষে কাশ্মীর এবং বাংলার এই বাগদেবী মন্দির ব্যতীত অন্য কোথাও বটুক ভৈরবের উপাসনা হয় না। ঐতিহাসিকভাবে কাশী বা উজ্জয়িনীর মতো প্রাচীন তীর্থে বটুক ভৈরবের আরাধনা প্রচলিত থাকলেও, বাংলার গ্রামীণ স্তরে এমন তন্ত্র-প্রভাবিত বটুক ভৈরবের উপস্থিতি সত্যিই অত্যন্ত বিরল এবং তাৎপর্যপূর্ণ। মা কালী, তারা এবং দুর্গার সাথে মহাকাল ও ভৈরবের এই সহাবস্থান প্রমাণ করে যে একসময় এখানে নিবিড় তান্ত্রিক সাধনা প্রচলিত ছিল। অন্যদিকে, দেবী ষষ্ঠীর উপস্থিতি গ্রামীণ লোকজীবনে সন্তান ও পরিবারের মঙ্গল কামনার প্রতীক।

বাগদেবী মন্দিরের প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে কোনো সুনির্দিষ্ট তাম্রলিপি বা শিলালিপি না থাকলেও, স্থানীয় জনশ্রুতি বাংলার ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের দিকে নির্দেশ করে। মনে করা হয়, ষোড়শ শতকে রঘুনন্দন বন্দ্যোপাধ্যায় নামের এক সিদ্ধপুরুষ এই পীঠস্থানটির সূচনা করেন। ঐতিহাসিক লোকশ্রুতি এবং জনবিশ্বাস অনুযায়ী, এই রঘুনন্দন বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন বাংলার ইতিহাস-বিখ্যাত 'বারো ভুঁইয়া'-দের অন্যতম, শ্রীপুরের প্রতাপশালী জমিদার চাঁদ রায়ের আধ্যাত্মিক গুরুদেব। গুরু রঘুনন্দনের হাত ধরেই এই নিভৃত অরণ্যপ্রান্তে দেবী আরাধনার সূত্রপাত ঘটেছিল বলে মনে করা হয়, যা আজও অমলীন।

বাগদেবী মন্দিরে সারাবছরই ভক্তদের সমাগম হয়, তবে ফাল্গুন মাসে এটি এক বিশাল উৎসবের আকার ধারণ করে। ফাল্গুন মাসের শনি ও মঙ্গলবার দেবীর বিশেষ পূজার দিন হিসেবে নির্দিষ্ট। এই দিনগুলিতে দূর-দূরান্ত থেকে হাজার হাজার ভক্ত তাদের মনস্কামনা পূরণের আশায় মন্দিরে ছুটে আসেন। ভক্তরা তাদের মনের বাসনা জানাতে প্রাচীন বটগাছের ডালে সুতো বা ঢিল বেঁধে দিয়ে যান। কার্যসিদ্ধি হলে দেবীর কাছে 'মাটির ঘোড়া' মানত করার এক সুপ্রাচীন রীতি এখানে আজও প্রচলিত, যা বাংলার ধর্মঠাকুর বা গ্রাম্য দেবতাদের পূজার রীতির সমগোত্রীয়। উৎসবের দিনগুলিতে মন্দির প্রাঙ্গণে এক বিশাল মেলা বসে এবং অগণিত ভক্তদের মাঝে বিনামূল্যে খিচুড়ি প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

বাগআঁচড়ার বাগদেবী মন্দির শুধুমাত্র একটি উপাসনালয় নয়, এটি বাংলার শাক্তধর্ম এবং গ্রামীণ লোকবিশ্বাসের এক অপূর্ব সংমিশ্রণ। শাস্ত্রীয় দেবী দুর্গা কীভাবে বাঘের উপদ্রব থেকে রক্ষাকর্ত্রী 'বাঘদেবী' বা 'বাগদেবী' রূপে সাধারণ মানুষের একান্ত আপন হয়ে উঠেছেন, এই মন্দির তারই এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। মহাকাল, বটুক ভৈরব, তারা, কালী এবং ব্যাঘ্র বাহিনীর এই একত্র অবস্থান প্রমাণ করে বাংলার ধর্মীয় সমন্বয়বাদের শেকড় কতটা গভীরে প্রোথিত।

গ্রন্থপঞ্জি / তথ্যসূত্র

১। মিত্র, অশোক। পশ্চিমবঙ্গের পূজা-পার্বণ ও মেলা, খণ্ড,২ (নদিয়া জেলা)। নয়া দিল্লি: পাবলিকেশনস ডিভিশন, ভারত সরকার, ১৯৬৮।

২। মল্লিক, কুমুদনাথ। নদিয়া কাহিনী (নদিয়ার ইতিহাস)। কলকাতা: পুস্তক বিপণি, ১৯১০।

৩। ভট্টাচার্য, অশুতোষ। বাংলার লোক-সংস্কৃতি। নয়া দিল্লি: ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ভারত, ১৯৭৮।

৪। রায়, অনিরুদ্ধ। অ্যাডভেঞ্চারার্স, ল্যান্ডওনার্স অ্যান্ড রেবেলস: বেঙ্গল (প্রায় ১৫৭৫,১৭১৫) (বারো-ভুঁইয়া ও স্থানীয় ইতিহাসের প্রেক্ষাপট)। নয়া দিল্লি: মুন্সিরাম মনোহরলাল পাবলিশার্স, ১৯৯৮।

৫। মৌখিক ইতিহাস ও লোকসংস্কৃতি আর্কাইভ: বাগাদেবী মন্দির,বাগআঁচড়া , শান্তিপুর এলাকার প্রধান পুরোহিত (সেবাইত) ও স্থানীয় ঐতিহ্যবাহী জনশ্রুতি থেকে সংগৃহীত তথ্য, আচার-অনুষ্ঠান ও প্রামাণ্য উপাদান।.

শান্তিপুরের তাঁত শিল্প: ইতিহাস, বিবর্তন, বয়ন-পর্যায় ও বর্তমান সংকট

অতনু দাস (ইতিহাস বিভাগ, ষষ্ঠ সেমিস্টার)

বাংলার লোকায়ত শিল্প ও বয়ন ঐতিহ্যের অন্যতম উজ্জ্বল নিদর্শন হল নদীয়ার শান্তিপুরের তাঁত শিল্প। বহু শতাব্দী প্রাচীন এই শিল্প কেবল একটি অর্থনৈতিক কাঠামো নয়, বরং বাংলার সমাজ-ইতিহাসের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। সূক্ষ্ম সুতোর বুনন, পাড়ের নিখুঁত নকশা এবং আবহাওয়া-উপযোগী আরামদায়ক জমিনের জন্য শান্তিপুরী শাড়ি সমাদৃত। এর অনন্য ভৌগোলিক স্বকীয়তার স্বীকৃতিস্বরূপ ২০০৯ সালে ভারত সরকার শান্তিপুরের শাড়িকে 'ভৌগোলিক নির্দেশক' প্রদান করে। (তথ্যসূত্র: Government of India– GI Registry Report, ২০০৯, পৃ. ৪৫)

শান্তিপুরের বয়ন শিল্পের প্রামাণ্য ইতিহাস পঞ্চদশ শতাব্দীর আদিভাগ থেকে পাওয়া যায়। ঐতিহাসিক নথি অনুযায়ী, ১৪০৯ খ্রিস্টাব্দে বাংলার গৌড়ের হিন্দু রাজা গণেশের (দনুজ মর্দন দেব) রাজত্বকালে শান্তিপুরে তাঁতিদের প্রথম সুসংগঠিত বসতি স্থাপিত হয়। পরবর্তীতে, শ্রী অদ্বৈত আচার্যের (১৪৬০-১৫৫৮) জীবনীর ওপর ভিত্তি করে রচিত 'অদ্বৈত মঙ্গল' গ্রন্থেও শান্তিপুরের এই বয়ন ঐতিহ্যের সুস্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায়, যা প্রমাণ করে যে সেই সময়কালেই এটি একটি সুপ্রতিষ্ঠিত শিল্প ছিল। (তথ্যসূত্র: Roy– Chandan, ২০১৭, পৃ. ৫২; Das– C. et al.– ২০১৬, পৃ. ২৮)

মুঘল আমল থেকে ব্রিটিশ যুগ পর্যন্ত এই শিল্পের প্রভূত উৎকর্ষ সাধিত হয়। নদীয়ার রাজা রুদ্র রায়ের রাজত্বকালে (১৬৮৩-১৬৯৪) উৎপাদিত শাড়ি আরব, গ্রিস ও তুরস্কে রপ্তানি হত। প্রযুক্তির ক্ষেত্রে বড় রূপান্তর আসে ব্রিটিশ আমলে। ১৮২৪ সাল নাগাদ মিলের সুতোর ব্যবহার এবং ১৯২০-২৫ সালের মধ্যে শ্রী দুর্গাদাস কাস্থের উদ্যোগে 'ব্যারেল ডবি' ও 'ফ্লাই শাটল' প্রযুক্তির প্রচলন হয়। (তথ্যসূত্র: Mitra– Ashis et al.– ২০০৯, পৃ. ১২-১৪)

একটি শান্তিপুরী শাড়ি তৈরি হওয়া একাধিক দক্ষ শ্রমিকের ধারাবাহিক কর্মযজ্ঞের ফসল। প্রথমে 'ডাইং' বা কাঁচা সুতোকে রাসায়নিক বা প্রাকৃতিক রঙে ফোটানো হয়। এরপর 'সাইজিং' পর্যায়ে সুতোকে মজবুত করতে ভাতের ফ্যান বা খইয়ের মাড় মিশিয়ে রোদে শুকানো হয়। চরকায় সুতো গোটানোর (ওয়াইন্ডিং) পর, বিশাল ড্রামের সাহায্যে লম্বালম্বি তানা (warp) প্রস্তুত করা হয়। সবশেষে, তাঁতযন্ত্রে মাকু চালনার মাধ্যমে আড়াআড়ি বানা (weft) তৈরি করে কাপড় বোনা হয়। (তথ্যসূত্র: Das– C. et al.– ২০১৬, পৃ. ৩১-৩৩)

শান্তিপুরী শাড়ির একটি অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হল এর নকশার বৈচিত্র্য এবং দুই বাংলার বয়নশৈলীর মিশ্রণ। দেশভাগের পর পূর্ববঙ্গের টাঙ্গাইল ও ঢাকা থেকে আগত বহু নিপুণ তাঁতি শান্তিপুর ও ফুলিয়া অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেন। এর ফলে আদি শান্তিপুরী ঘরানার সাথে টাঙ্গাইল ও জামদানি শৈলীর এক ঐতিহাসিক মেলবন্ধন ঘটে। শান্তিপুরের নিজস্ব ঐতিহ্যবাহী পাড়ের নকশাগুলির মধ্যে 'ভোমরা', 'রাজমহল', 'চাঁদমালা', 'তেড়ছি' এবং 'নীলাম্বরী' উল্লেখযোগ্য। এই নকশাগুলি সাধারণত অতিরিক্ত ওয়েফট (extra weft) পদ্ধতিতে জ্যাকার্ড বা ডবি যন্ত্রের সাহায্যে অত্যন্ত নিখুঁতভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়। প্রতিটি শাড়ির জমিন ও পাড়ের এই মেলবন্ধন শুধু সুতোর কাজ নয়, বরং বাংলার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের এক জীবন্ত ক্যানভাস। (তথ্যসূত্র: Mitra– Ashis et al.– ২০০৯, পৃ. ১৮-২০; Roy– Chandan, ২০১৭, পৃ. ৫৪-৫৫)

দীর্ঘ গৌরবময় ইতিহাস সত্ত্বেও শান্তিপুরের তাঁত শিল্প আজ গভীর কাঠামোগত সংকটের সম্মুখীন। পাওয়ারলুম বা যান্ত্রিক তাঁতের আগ্রাসনে দ্রুত ও সস্তায় উৎপাদিত শাড়ির সাথে হস্তচালিত তাঁত অসম প্রতিযোগিতায়

ক্রমশ পিছিয়ে পড়ছে। এর পাশাপাশি সবচেয়ে বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে মহাজনদের একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ। কাঁচামালের অত্যাধিক মূল্যবৃদ্ধির কারণে স্বাধীন তাঁতিরা আজ নামমাত্র মজুরির শ্রমিকে পরিণত হয়েছেন। একজন সুদক্ষ তাঁতির দৈনিক আয় বর্তমানে মাত্র ১৫০-২০০ টাকায় নেমে এসেছে, যা পরিবারের গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য নিতান্তই অপ্রতুল। আয়ের এই নিদারুণ অভাবের কারণে নবীন প্রজন্ম পৈতৃক পেশা ত্যাগ করে ভিনরাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিক হিসেবে পাড়ি জমাচ্ছে। খাতায়-কলমে 'হ্যান্ডলুম সংরক্ষণ আইন' থাকলেও বাস্তবের মাটিতে তার প্রয়োগ না থাকায় এই ঐতিহ্যবাহী শিল্প আজ অবলুপ্তির পথে। (তথ্যসূত্র: Narasaiah & Krishna, ১৯৯৯, পৃ. ৪২-৪৫)

শান্তিপুরের তাঁত শিল্প আমাদের এক অমূল্য অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সম্পদ। একে বাঁচাতে প্রয়োজন সরকারি স্তরে কঠোর পদক্ষেপ, কাঁচামালে ভর্তুকি প্রদান, সমবায় সমিতিগুলির দুর্নীতিমুক্তকরণ এবং তাঁতিদের সরাসরি বাজারের সাথে যুক্ত করা। আধুনিক বাজারের সাথে ঐতিহ্যের মেলবন্ধন ঘটাতে না পারলে, শতবর্ষের এই বয়ন-ঐতিহ্য অচিরেই ইতিহাসের পাতায় চিরতরে স্তব্ধ হয়ে যাবে।

References:

- . Roy, Chandan. (2017). "The silk handloom industry in Nadia district of West Bengal: a study on its history, performance & current problems." *New Man International Journal of Multidisciplinary Studies*, Vol. 4, No. 7, pp. 50-66.

- . Das, C., Roy, M., & Mandal, P. (2016). "Handloom cluster of India: A Case Study of Shantipur Handloom Cluster." *International Journal of Humanities and Social Science Intervention*, Vol. 5(1), pp. 27-35.

- . Mitra, Ashis, et al. (2009). *A diagnostic report on cluster development programme of Shantipur handloom cluster, Nadia, West Bengal.* Textiles Committee, Government of India.

- . Government of India. (2009). *Geographical Indications Registry Report: Shantipur Saree.* Ministry of Commerce and Industry.

- . Narasaiah, M. L., & Krishna, C. (1999). *Crisis in Handloom Industry.* Discovery Publishing House.

দিগনগরের রাঘবেশ্বর মন্দির : স্থাপত্য ও ইতিহাসের এক অনন্য মেলবন্ধন

পল্লবী সরকার (ইতিহাস বিভাগ, ষষ্ঠ সেমিস্টার)

প্রখ্যাত সমালোচক বিনয় ঘোষের মতে, ''দিগনগরের রাঘবেশ্বর মন্দিরটি কেবল একটি ধর্মীয় উপাসনালয় নয়, এটি মধ্যযুগীয় বাংলার শিল্পচেতনা ও সমাজ কাঠামোর এক জীবন্ত ইতিহাস।'' বাংলার মন্দির স্থাপত্যের ইতিহাসে নদীয়া জেলার শান্তিপুর-কৃষ্ণনগর সংলগ্ন দিগনগর গ্রামের এই রাঘবেশ্বর শিব মন্দিরটি একটি উজ্জ্বল নজীর। নদীয়া রাজবংশের কীর্তি এবং বাংলার ঐতিহ্যবাহী 'চারচালা' স্থাপত্যরীতির এই নিদর্শনটি আজও ইতিহাসের এক মহতী সাক্ষী হয়ে সগৌরবে দাঁড়িয়ে আছে।

নদীয়া রাজবংশের অন্যতম শক্তিশালী রাজা এবং মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের প্রপিতামহ রাজা রাঘব রায় (রাজত্বকাল ১৬৩২-১৬৮৩ খ্রিষ্টাব্দ) তার রাজত্বে এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ইতিহাসের পাতায় চোখ রাখলে দেখা যায়, তিনি যখন নদীয়ার রাজধানী মাটিয়ারি থেকে রেউই-তে (বর্তমান কৃষ্ণনগর) সরিয়ে আনেন, তখন যাতায়াতের সুবিধার জন্য একটি প্রশস্ত রাজপথ নির্মাণ করেছিলেন। এই রাস্তার ধারেই তৃষ্ণার্ত পথিকদের জলকষ্ট নিবারণের জন্য তিনি ২০ হাজার টাকা ব্যয়ে একটি বিশাল দিঘি খনন করেন।

কথিত আছে, এই দিঘীটি খননের সময় জলের তলদেশ থেকে একটি বিশালাকার কালো কষ্টি পাথরের শিবলিঙ্গ পাওয়া গিয়েছে। সেই শিবলিঙ্গটিকে কেন্দ্র করেই ১৬৬৯ খ্রিষ্টাব্দে (১৫৯১ শকাব্দে) তিনি এই সুরম্য শিব মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করেন। রাজা রাঘব রায় নিজের নামানুসারে মন্দিরটির নাম রাখেন রাঘবেশ্বর শিব মন্দির। এই দিঘি বা 'দীর্ঘিকা' থেকেই গ্রামটির নাম হয় 'দীর্ঘিকানগর', যা কালক্রমে 'দিগনগর' হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। মন্দিরের পশ্চিম দেওয়ালের কার্নিশের নিচে খোদাই করা সংস্কৃত শিলালিপিটি ইতিহাসের এক অকাট্য দলিল। লিপিটির ভাষ্য অনুযায়ী: ''১৫৯১ শকাব্দে পবিত্র রত্নাকর সুত, দ্বিজশ্রেষ্ঠ, ভূমিপালকের প্রধান ধীরস্বভাব শ্রীযুক্ত রাঘব স্বচ্ছ তরঙ্গমালা ও নির্মল জলধারা সমৃদ্ধ উজ্জ্বল দিঘি খনন করে তার তীরে এই শিব মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করেন।''

স্থাপত্যশৈলীর বিচারে এটি একটি আদর্শ 'চারচালা' মন্দির। মন্দিরের প্রধান আকর্ষণ হলো এর সম্মুখভাগের সূক্ষ্ম এবং নিপুণ টেরাকোটা বা পোড়ামাটির অলঙ্করণ। মন্দিরের দেওয়ালে রামায়ণ ও মহাভারতের বিভিন্ন দৃশ্য, বিশেষ করে রাম-রাবণের যুদ্ধ এবং শ্রীকৃষ্ণের মথুরা যাত্রার কাহিনী অত্যন্ত নিপুণভাবে খোদাই করা আছে। মন্দিরের খিলানে বিষ্ণুর দশাবতারের মূর্তি এবং সমসাময়িক সমাজচিত্র যেমন; শিকারের দৃশ্য, পালকিতে জমিদারের যাত্রা এবং সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার ছবি অত্যন্ত দক্ষতার সাথে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। মন্দিরের প্রবেশপথের নিচে চৌকাঠ হিসেবে মোটা ও ভারী কালো পাথরের ব্যবহার এর প্রাচীন গাম্ভীর্যকে আরও বাড়িয়ে দেয়।

রাঘবেশ্বর শিব মন্দিরটি কেবল পাথর বা ইটের স্থাপত্য নয়, এটি নদীয়া রাজবংশের আভিজাত্য এবং বাংলার মধ্যযুগীয় স্থপতিদের নিপুণ হাতের ছোঁয়ায় গড়া এক মহাকাব্য। নদীয়া রাজবংশের বৈষ্ণব প্রীতির কারণে শিব মন্দির হলেও এখানে নারায়ণ বা শালগ্রাম শিলার উপস্থিতি দেখা যায়, যা বাংলার ধর্মীয় ইতিহাসে 'হরি-হর' (শিব ও বিষ্ণু) ভাবনার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। বর্তমানে এই অমূল্য সম্পদটি পশ্চিমবঙ্গ প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ দ্বারা সংরক্ষিত। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মৃতিধন্য এই গ্রাম এবং তার এই মন্দিরটি রক্ষা করা আমাদের জাতীয় কর্তব্য। ইতিহাস এর এই অনন্য সম্পদটি আজও পর্যটক ও গবেষকদের কাছে এক পরম আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে রয়েছে।

সহায়কগ্রন্থ

১. 'নদীয়া কাহিনী' , কুমুদনাথ মল্লিক (নবপত্র প্রকাশন - ১৯১০)

২. 'নদীয়া জেলার পুরাকীর্তি' , মোহিত রায় (পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য প্রত্নতত্ত্ব অধিকার - ১৯৭৫)

৩. The Temples of Bankura Districtক – David J. McCutchion SWriters Workshop - ১৯৭২)

৪. 'পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি' , বিনয় ঘোষ (প্রকাশ ভবন - ১৯৫৭)

৫. 'নদীয়া দর্পণ' , খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় (স্থানীয় প্রকাশনা - ১৯২০-এর দশক)

একটি খোলা চিঠি

সুস্নিগ্ধা নাথ, (এস.এ.সি.টি. শিক্ষিকা, দর্শন বিভাগ)

তোমার সাথে আমার শৈশবেই সেই প্রথম দেখা; আজও চোখ বন্ধ করলে স্পষ্ট ভেসে ওঠে। মনে পড়ে যায় বাবার সেই বলা কথা; কলেজের সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় তোমাকে দেখিয়ে তিনি নরম গলায় বলতেন, ''তুমি কি একদিন এখানে পড়বে?" সেই ছোট বয়সে এই প্রশ্নটা কতবড়, কত গভীর; তা তখন বোঝার মতো বয়স ছিল না। পরে অবশ্য বুঝেছি সেই সরল প্রশ্নের মধ্যেই লুকিয়ে থাকত অনেক অনুচ্চারিত ভাবনা। পারিবারিক কিছু প্রতিবন্ধকতার কারণে আদৌ কলেজ পর্যন্ত পৌঁছতেপারব কি না; এই সংশয় যেন বাবার মনেও ছিল, পরে আমার মনেও। ঠিক সেই অনিশ্চয়তার ভেতর থেকেই জন্ম নিয়েছিল এক গভীর স্বপ্ন, এক অদম্য জেদ;একদিন এই প্রাঙ্গণে পা রাখতেই হবে। তখনো জানতাম না, তুমি একদিন আমার জীবনের সবচেয়ে গভীর অনুভূতিগুলোর একটি হয়ে উঠবে। দূর থেকে তোমাকে দেখতাম, তোমার পরিসর, তোমার শান্ত সবুজ পরিবেশ, ছাত্রছাত্রীর ভিড়; সবকিছুই এক অদ্ভুত টান তৈরি করত, কিন্তু সামনাসামনি দেখা যেন তখনও ভাগ্যের লিখনে ছিল না। যখন তোমার সঙ্গে সত্যিকারের সখ্যতা গড়ে তোলার সেই সুযোগ এল, গ্রাজুয়েশনে ভর্তির সেই গুরুত্বপূর্ণ সময়; তখনও ভাগ্য যেন দূরত্বটাই বেছে নিল। গ্রাজুয়েশনের সেই অধ্যায়েও তোমার সঙ্গে সখ্যতা গড়ে ওঠার পথটুকু অপূর্ণই রয়ে গেল। তারপর কৃষ্ণনগর গভর্নমেন্ট কলেজে ভর্তি হতে হল, কারণ আর্থিক সচ্ছলতার যথেষ্ট অভাব ছিল যে! মনে হলো,আর বুঝি কখনোই তোমার সঙ্গে সেই বহুল কাঙ্ক্ষিত সখ্যতা হবে না। মনের ভেতর কথার আদান, প্রদান চললেও,বাস্তবের দূরত্বটা থেকেই গেল অবিচল।

কিন্তু জীবন যে কত অদ্ভুতভাবে মুহূর্তের পর মুহূর্ত বদলে দেয়! ২০১৭ সাল;জীবনের এক অবিস্মরণীয় বছর। প্রথমবার শিক্ষিকা হিসেবে যখন তোমার দরজা পেরিয়ে ভেতরে ঢুকলাম, তখন বুঝলাম;স্বাক্ষাৎ শুধু দেরিতে হয়েছিল,কিন্তু অসম্পূর্ণ নয়। শিক্ষকতার টেবিলে প্রথম বসেই উপলব্ধি করলাম, তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্ক কেবল পরিচয়ের নয়; এ এক গভীর, আত্মিক বন্ধন। এই প্রাঙ্গণের প্রতিটি ইট, প্রতিটি শ্রেণিকক্ষ, প্রতিটি করিডোর যেন আমাকে চেনা ভাষায় স্বাগত জানিয়েছে। এইবছর গুলোতে শান্তিপুর কলেজ-তুমি শুধু আমার কর্মস্থল ছিলেনা, ছিলে আমার আরেক পরিবার। যেখানে ছাত্রছাত্রীদের হাসিমুখ, তাদের কৌতূহল,তাদের অপ্রতীম শ্রদ্ধা, ভালবাসা আর অদম্য উদ্দীপনা আমাকে প্রতিদিন নতুনভাবে বাঁচতে শিখিয়েছে,আমার প্রতিটি দিনকে নতুন অর্থ দিয়েছে। সহকর্মীদের উষ্ণ ব্যবহার, আন্তরিক সহযোগিতা, প্রতিদিনের আড্ডা; সব কিছু যেন এক অন্তরঙ্গ বন্ধনে জড়ানো, সবকিছু মিলে অবলীলায় গড়ে ওঠা সৌহার্দ্য; এ যেন এক পরিবার, যেখানে প্রত্যেকেই আপন। ধীরে ধীরে তুমি আমার জীবনের এক গভীর আবেগ হয়ে উঠলে।

তোমাকে নতুনভাবে গড়েতোলার, সাজিয়ে তোলার ভাবনা ধারাবাহিক ভাবে বহুবারই এসেছে বিভিন্ন সময়ে, কিন্তু তার সত্যিকারের রূপ যেন ফুটে উঠেছে এই সাম্প্রতিক পর্বে; যখন তোমার চারপাশ শান্ত, স্থির, অথচ ধীরে ধীরে দৃশ্যমান ভাবে বদলে উঠছে। দায়িত্বে থাকা কর্তৃপক্ষের আন্তরিকতা, নীরব কর্মপ্রচেষ্টা আর স্নিগ্ধ মানবিক ছোঁয়ায় তুমি আজ আরও সুশৃঙ্খল,আরও সুন্দর রূপে ফুটে উঠছ। এই পরিবর্তনের সরাসরি সাক্ষী হতে না পারলেও, তোমার এই বিকাশ আমার কাছে এক গভীর তৃপ্তি ও আনন্দের উৎস। দূর থেকে হলেও তোমার এই নতুন সাজে দীপ্ত হয়ে ওঠা; মনকে এক আশ্চর্য শান্তি আর অপরিসীম পূর্ণতার অনুভূতি দেয়।

আজ যখন নতুন পথের ডাক এসেছে; যোগদানের আনন্দ অবশ্যই আছে; নতুনযাত্রা, নতুনদায়িত্ব, নতুন অভিজ্ঞতা, নতুন চ্যালেঞ্জ; সবই আনন্দের। কিন্তু তার পাশেই আছে এক নরম, গভীর বিষণ্ণতা। কারণ, যে

স্থানে এতটা সময় কাটিয়েছি, যে জায়গাটি আমাকে শুধু শিক্ষিকা নয়, মানুষ হিসেবেও আরও পরিণত করেছে; সেখান থেকে দূরে যাওয়া কখনোই সহজ নয়। তোমার দেওয়া ভালোবাসা, স্নেহ, সম্মান; সবই আজও আমাকে ঘিরে থাকে। হয়তো চাকরির নিয়মে অন্য প্রতিষ্ঠানে পা বাড়াব, কিন্তু মন জানে; তুমি আমার ভেতরে রয়ে যাবে গভীরতম স্থানে। মানুষের জীবনে কিছু সম্পর্ক আছে যা মুখোমুখি দেখা থেকে নয়, আত্মার মিলন থেকে জন্মায়। তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্ক ঠিক তেমনই; নিঃশব্দ,অথচ গভীর, অদৃশ্য অথচ অটুট।

যে মায়া এই কলেজকে ঘিরে আছে, তা ভাষায় প্রকাশ করার মতো নয়। এ মায়া দিনের পর দিন গড়ে ওঠা ভালোবাসা, সম্পর্ক, বিশ্বাস আর অগণিত স্মৃতির মিশ্রণে তৈরি। তাই ভীষণভাবে অনুভব করি;আমি হয়তো শারীরিক ভাবে এগিয়ে যাব, কিন্তু হৃদয়ের একটা অংশ এখানেই থেকে যাবে। আজ এই মুহূর্তে তাই শুধু একটাই কথা মনে হয়; তোমার থেকে দূরে যাচ্ছি ঠিকই, কিন্তু তোমাকে ভুলে যাওয়া আমার পক্ষে কোনোদিনই সম্ভব নয়। তুমি আমার পেশাগত জীবনের প্রথম প্রেম, প্রথম আত্মবিশ্বাস, প্রথম অগ্রযাত্রা। আর প্রথমদের যে কখনও মন থেকে মুছে ফেলা যায় না।

শান্তিপুর কলেজ, তুমি আমার জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অধ্যায়। তুমি আমাকে গড়ে তুলেছ, তুমি আমাকে শিখিয়েছ, তুমি আমাকে আজকের অবস্থানে পৌঁছে দিয়েছ। তাই তোমার প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা আর এক অনির্বচনীয় টান সবসময়ই আমাকে ঘিরে রাখবে। তুমি থাকবে; আমার প্রতিটি অর্জনের সঙ্গে, প্রতিটি স্মৃতির ভেতর, প্রতিটি সাফল্যের পাশে। তুমি থাকবে আমার জীবনের প্রতিটি অধ্যায়ে; এক অনির্বচনীয় মায়া হয়ে, এক অনুপম আশ্রয় হয়ে। ভালথেকো-আমার গর্ব, আমার চিরসবুজ ভালবাসা..

রামধনু ইচ্ছে

শুচিস্মিতা সান্যাল (সহযোগী অধ্যাপিকা, বাংলা বিভাগ)

তারপর পাইনবনে আমি তোমাকে বলব,
সুন্দর একটা ছবি তুলে দাও -
তোমার ক্যামেরায় তত ভালো ছবি হয় কি?
সন্দিহান তুমি লেন্সে চোখ রেখে
আমাকে দেখে সব ভুলে গেলে।
তোমার ইচ্ছে করতে লাগল আমাকে বুকের ভিতর লুকিয়ে ফেলতে -
জগতের কারুর সঙ্গে ভাগ করবে না কখনো।
আমি তখন ভাবছি রডোডেনড্রনের নীচে,
তোমার কোলে মাথা রেখে শুয়ে
থাকা যেত যদি, চারদিকে রঙিন ফুল
মেঘ কুয়াশা আর
অচেনা সব পাখি, প্রজাপতি।
মনের মধ্যে বানিয়ে ফেলি এসো
ইডেন গার্ডেন, যেখানে 'অভিমানের প্রবেশ নিষেধ'
বোর্ড টাঙানো আছে প্রবেশদ্বারে।

Not Optional, Not Decorative: The Real Need for a Department of English in a College

Sumana Ghosh, (SACT – 01, Department of English, Santipur College)

What does a department of English actually do to a college that other departments do not? The answer is not simply that it teaches literature or improves communication. Every department teaches something useful. The difference is that most departments train students to work within an existing system, while the department of English trains them to examine the system itself.A department of Physics teaches students how the physical world functions. A department of Economics explains markets and finance. A department of Computer Science teaches students how to build programs and manage data. These departments are essential, but they usually move toward a clear goal: solving a problem, producing a result, or mastering a technique. Their success is often measured by accuracy, efficiency, and application.The department of English performs a different function. It asks questions that other departments often leave untouched. Why do we describe some ideas as "normal" and others as "dangerous"? Why are some voices heard while others remain silent? Why do institutions use certain kinds of language to justify themselves? Why do people obey ideas that may not be in their interest? In other words, the department of English does not merely teach students what to think about the world; it teaches them to examine the language, values, and assumptions through which the world is understood.

That is why a department of English changes the atmosphere of an entire college. It introduces self-criticism into the institution. Without it, a college can become highly skilled but intellectually narrow. Students may learn how to perform tasks, but not how to question the purpose of those tasks. They may become efficient workers without becoming reflective human beings.The difference becomes clear if one compares the classroom methods of English with those of most other departments. In many subjects, students are trained to arrive at the correct answer. A mathematics student solves an equation; a chemistry student identifies a reaction; a law student interprets a statute. The English classroom operates differently. It begins from the idea that there may not be one final answer.

When students read a poem, a novel, or a play, they are asked to interpret, argue, doubt, and reconsider. They must defend their reading with evidence, but they also learn that another interpretation may reveal something equally important.

This does not mean that "anything is true." It means that truth is often more complicated than it first appears.For example, a student reading Shakespeare's *Hamlet* is not asked only what happens in the play. They are asked why Hamlet hesitates, whether his hesitation is weakness or moral intelligence, whether revenge can ever be justified, and whether the language of the play reveals a society already collapsing from within. A student of English therefore learns not only to understand a text but to think through contradiction.No other department does this in quite the same way. The department of English trains students to remain in uncertainty without becoming intellectually lazy or emotionally impatient. It teaches them that complicated problems require slow thought.John Keats called this ability "negative capability": the capacity to remain "in uncertainties, Mysteries, doubts, without any irritable reaching after fact and reason." The department of English is one of the few places in a college where this ability is deliberately cultivated. In an age of social media, instant opinion, and political polarisation, that ability has become extremely rare.

Every institution speaks in a particular language, and that language quietly carries assumptions about what matters, what can be ignored, and who has the right to speak. Colleges themselves are full of such language. They speak constantly of "productivity," "efficiency," "placement," "skill development," and "market readiness." At first these words sound practical. Yet if they are repeated often enough, they begin to define the entire purpose of education. A student slowly stops being understood as a thinking person and becomes a future employee; knowledge stops being valued for its intellectual or ethical importance and becomes valuable only if it can be sold.Without a department of English, very few people inside the college are trained to notice this shift. Other departments may prepare students to work within the existing structure of society. The department of English asks whether that structure is just, humane, or even sensible. It does not merely ask, "How does this system work?" It asks, "Who benefits from this system? Whom does it exclude? What language is being used to make inequality appear natural?"

George Orwell explained this danger in his essay *Politics and the English Language*. Orwell argued that political and institutional power often depends upon vague language because vague language prevents people from recognising the truth. Governments do not say that civilians have been killed; they call it "collateral damage." Universities do not admit that they are treating students like customers; they speak of "delivering outcomes." Companies do not say that workers are being dismissed; they speak of "restructuring." Orwell's point was simple but devastating: once language becomes dishonest, thought itself becomes dishonest.The department

of English trains students to resist this dishonesty. Close reading is not merely an academic exercise. When students analyse a poem, a speech, or a novel, they learn to notice contradiction, silence, irony, euphemism, and hidden intention. They learn that what is absent from a text may be as important as what is present. A student who has learned to read in this way is less likely to accept slogans, advertisements, political speeches, or official statements without question.

This is why the department of English affects every other discipline. An engineering student may know how to build a machine, but English teaches that student to ask who will use the machine, whose labour will support it, and whether the language surrounding "progress" hides new forms of exploitation. A medical student may learn how to diagnose disease, but English teaches that student how illness is narrated, how suffering is spoken about, and how the language of medicine can either humanise or dehumanise patients. A business student may learn how to manage an organisation, but English forces that student to ask why profit is often treated as more important than dignity.Martha Nussbaum argues in *Not for Profit: Why Democracy Needs the Humanities* that when colleges neglect the humanities, they begin to produce what she calls "useful machines": people who are technically competent but incapable of critical thought or moral imagination. Such people may be successful, but they are easily manipulated because they have never learned to question the values built into the institutions around them.

The department of English prevents this. It teaches students to live with complexity instead of rushing toward easy answers. Cleanth Brooks, in *The Well Wrought Urn*, argued that literature is built upon paradox: two conflicting truths may exist at the same time. A serious student of English therefore learns that mature thought requires patience. Shakespeare's *Hamlet* is valuable not because it offers certainty, but because it forces readers to remain inside uncertainty. Hamlet cannot act because every possible action seems morally compromised. Students who study him learn that real life often works in the same way.No other department gives the college this particular form of intelligence. Other departments teach students how to master the world. The department of English teaches them how to question the world, and, more importantly, how to question themselves. Without that capacity, a college may still produce skilled workers and efficient professionals. But it will no longer produce fully educated human beings.

An intellectually active department of English changes the entire culture of a college. It does not allow discussion to end with facts, formulas, or technical skill.

Instead, it teaches students to ask what lies beneath them. Economics is no longer only about markets; it becomes a way of thinking about inequality, class, and representation. Technology is no longer only about innovation; it raises questions of ethics, power, and responsibility. Medicine is no longer only about curing disease; it becomes attentive to suffering, memory, and the human experience. Raymond Williams argues in *The Long Revolution* that culture is "ordinary": it exists in everyday habits, language, and institutions. A department of English therefore does not merely add literature to the curriculum; it changes the culture of the college itself. It influences how students think, what kinds of questions they ask, and what forms of knowledge they learn to value.

At a time when colleges increasingly measure everything in terms of jobs, profit, and efficiency, the department of English keeps alive a different idea of education. It resists the belief that students are merely future employees and that knowledge matters only if it can be sold. Across many institutions, courses are redesigned for the market, reading becomes shorter and more functional, and students are encouraged to ask only one question: "What career will this give me?" The department of English challenges this narrow logic. Terry Eagleton argues in *Literary Theory*: *An Introduction* that literature is valuable because it exposes the assumptions and ideologies hidden inside apparently ordinary language. What appears "natural" or "common sense" is often shaped by power.More than any other department, the department of English teaches students to question what institutions present as normal. It asks why some histories are remembered and others erased, why certain voices are heard while others remain silent, and why societies so often disguise inequality as necessity.

In the end, a department of English is not an ornament at the margins of a college; it is one of the conditions that make the college worthy of the name. It gives the institution the courage to question itself, the patience to think beyond easy answers, and the language to confront truths that other disciplines often leave untouched. A college may produce successful graduates without it, but it cannot produce fully awake minds. The department of English reminds students that education is not only about learning how to live in the world, but also about learning how to understand it—and, when necessary, how to change it.

শিবরাম চক্রবর্তী: রসিকতার আয়নায় মধ্যবিত্ত সমাজ ও অর্থনীতি

ডঃ নবেন্দু বসাক (সহযোগী অধ্যাপক, বাণিজ্য বিভাগ)

লেখক শিবরাম চক্রবর্তী-এর সাহিত্যকে শুধু হাস্যরসের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দেখলে তাঁর প্রকৃত মূল্যায়ন করা হয় না। তাঁর রচনার গভীরে প্রবেশ করলে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, তিনি মূলত সমাজ ও অর্থনীতির সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষক ছিলেন। তাঁর কৌতুক, শব্দরস ও ব্যঙ্গ আসলে বৃহত্তর সামাজিক বাস্তবতার প্রতিফলন। তিনি যে সময়ে লিখেছেন, সেই সময়ের মধ্যবিত্ত বাঙালির জীবনসংগ্রাম, অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা, সামাজিক বৈপরীত্য;এসবই তাঁর লেখায় হাসির মোড়কে ধরা পড়েছে।

তাঁর সাহিত্যকে অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে প্রথমেই যে বিষয়টি চোখে পড়ে, তা হলো তাঁর চরিত্রগুলোর আর্থসামাজিক অবস্থান। তাঁর গল্পের অধিকাংশ চরিত্রই নিম্ন-মধ্যবিত্ত বা মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষ; যারা সীমিত আয়ে সংসার চালায়, কিন্তু স্বপ্ন দেখে বড় কিছু করার। এই শ্রেণির মানুষের দৈনন্দিন সংকট;যেমন অর্থের অভাব, চাকরির অনিশ্চয়তা, সামাজিক সম্মান রক্ষা;এসবই তাঁর লেখায় অত্যন্ত বাস্তবভাবে উঠে এসেছে। উদাহরণ হিসেবে হর্ষবর্ধন ও গোবর্ধনের কথা বলা যায়। এই দুই চরিত্র শুধু হাসির উৎস নয়, বরং তারা মধ্যবিত্ত মানসিকতার প্রতীক। হর্ষবর্ধনের অদ্ভুত ব্যবসায়িক বুদ্ধি প্রায়শই বাস্তবতার সঙ্গে খাপ খায় না, কিন্তু তার মধ্যে মধ্যবিত্ত মানুষের দ্রুত উন্নতির আকাঙ্ক্ষা স্পষ্ট। অন্যদিকে গোবর্ধনের সরলতা ও বিভ্রান্তি সাধারণ মানুষের বাস্তব জ্ঞানের সীমাবদ্ধতাকে তুলে ধরে। এই দুই চরিত্রের মাধ্যমে শিবরাম দেখিয়েছেন, অর্থনৈতিক উন্নতির স্বপ্ন অনেক সময় অযৌক্তিক সিদ্ধান্তে পৌঁছে দেয়।

শিবরামের নিজের জীবনও অর্থনৈতিক দিক থেকে খুব স্থিতিশীল ছিল না। তিনি প্রথাগত চাকরিজীবী ছিলেন না, ফলে তাঁর আয়ের উৎস ছিল অনিশ্চিত। এই অনিশ্চয়তা তাঁর লেখায় প্রতিফলিত হয়েছে। তিনি নিজের অভিজ্ঞতাকে রসিকতার মাধ্যমে তুলে ধরেছেন, কিন্তু সেই হাসির আড়ালে লুকিয়ে আছে জীবনের কঠিন বাস্তবতা। উদাহরণস্বরূপ, তাঁর আত্মজীবনীমূলক রচনায় আমরা দেখি কীভাবে তিনি অর্থাভাবে ভুগেছেন, কিন্তু সেই অভাবকে কখনোই দুঃখ হিসেবে নয়, বরং হাসির উপাদান হিসেবে ব্যবহার করেছেন।এখানেই তাঁর বিশেষত্ব; তিনি অর্থনৈতিক সংকটকে ট্র্যাজেডি হিসেবে না দেখিয়ে, সেটিকে সামাজিক ব্যঙ্গের উপাদানে পরিণত করেছেন। তাঁর লেখায় বারবার দেখা যায়, অর্থের অভাব সত্ত্বেও মানুষ কীভাবে আত্মসম্মান বজায় রাখার চেষ্টা করে। এই আত্মসম্মান রক্ষার প্রচেষ্টাই অনেক সময় হাস্যকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করে, কিন্তু সেই হাসির মধ্যে রয়েছে গভীর মানবিকতা।

শিবরামের লেখায় সমাজের ভণ্ডামি ও বৈষম্যের চিত্রও স্পষ্ট। তিনি দেখিয়েছেন, সমাজে অর্থনৈতিক অবস্থান অনুযায়ী মানুষের মূল্যায়ন করা হয়। ধনী ব্যক্তিরা সহজেই সম্মান পায়, আর গরিব বা নিম্ন-মধ্যবিত্ত মানুষকে নানা অপমান সহ্য করতে হয়। এই বৈষম্যকে তিনি সরাসরি আক্রমণ না করে, কৌতুকের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। ফলে পাঠক হাসতে হাসতে সমাজের এই অসঙ্গতিগুলো উপলব্ধি করতে পারে।উদাহরণস্বরূপ, তাঁর অনেক গল্পে দেখা যায়, কোনো চরিত্র সামান্য অর্থ বা সামাজিক মর্যাদা অর্জন করলেই তার আচরণ বদলে যায়। সে নিজেকে উচ্চবিত্ত মনে করতে শুরু করে এবং অন্যদের ছোট করে দেখতে থাকে। এই প্রবণতা আজকের সমাজেও দেখা যায়। লেখক শিবরাম এই মানসিকতাকে ব্যঙ্গ করেছেন অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে।

অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো ভোগবাদিতা। শিবরামের সময়ে যদিও

বর্তমানের মতো ভোগবাদী সমাজ গড়ে ওঠেনি, তবুও তার প্রাথমিক লক্ষণগুলো তিনি লক্ষ্য করেছিলেন। তাঁর গল্পে প্রায়ই দেখা যায়, মানুষ অপ্রয়োজনীয় জিনিস কেনার প্রতি আকৃষ্ট হয়, শুধুমাত্র সামাজিক মর্যাদা দেখানোর জন্য। এই প্রবণতা আজকের ভোক্তাবাদী সমাজে আরও প্রবল হয়েছে।

এছাড়া, তাঁর লেখায় বেকারত্বের সমস্যাও উঠে এসেছে। শিক্ষিত যুবকদের চাকরি না পাওয়া, বা অল্প আয়ের চাকরিতে সন্তুষ্ট থাকতে বাধ্য হওয়া;এসব বিষয় তিনি কৌতুকের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। কিন্তু এর মাধ্যমে তিনি আসলে একটি বড় সামাজিক সমস্যার দিকেই ইঙ্গিত করেছেন। আজও এই সমস্যা সমানভাবে প্রাসঙ্গিক, যা তাঁর সাহিত্যকে আরও তাৎপর্যপূর্ণ করে তোলে।

শিবরামের লেখায় অর্থনৈতিক সম্পর্কের সঙ্গে মানবিক সম্পর্কের টানাপোড়েনও দেখা যায়। অর্থের অভাব অনেক সময় সম্পর্কের উপর প্রভাব ফেলে;বন্ধুত্ব, আত্মীয়তা, এমনকি ভালোবাসাও অর্থনৈতিক বাস্তবতার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। তিনি এই বিষয়গুলোকে অত্যন্ত সহজভাবে উপস্থাপন করেছেন, যাতে পাঠক নিজের জীবনের সঙ্গে মিল খুঁজে পায়।

তাঁর ভাষাশৈলীও এই অর্থনৈতিক ও সামাজিক বাস্তবতাকে ফুটিয়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। তিনি যে কথ্যভাষা ব্যবহার করেছেন, তা মূলত মধ্যবিত্ত সমাজের ভাষা। ফলে তাঁর লেখার সঙ্গে পাঠকের একটি সরাসরি সংযোগ তৈরি হয়। এই ভাষার মধ্যেই লুকিয়ে আছে সেই সময়ের সমাজ ও অর্থনীতির প্রতিচ্ছবি।সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, শিবরাম চক্রবর্তী কখনোই নিরাশাবাদী ছিলেন না। তিনি জীবনের কঠিন বাস্তবতাকে স্বীকার করেছেন, কিন্তু তা নিয়ে হতাশ হননি। বরং তিনি দেখিয়েছেন, হাস্যরসের মাধ্যমে কীভাবে জীবনের কষ্টকে সহনীয় করে তোলা যায়। এই দৃষ্টিভঙ্গি অর্থনৈতিক দিক থেকেও গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটি মানুষকে মানসিকভাবে দৃঢ় থাকতে সাহায্য করে।

বর্তমান প্রেক্ষাপটে শিবরামের সাহিত্য আরও প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। আজকের বিশ্বে অর্থনৈতিক বৈষম্য, বেকারত্ব, ভোগবাদিতা;এসব সমস্যা আরও প্রকট। এই পরিস্থিতিতে তাঁর লেখাগুলো আমাদের নতুন করে ভাবতে শেখায়। তিনি আমাদের বুঝিয়েছেন, অর্থনৈতিক উন্নতি গুরুত্বপূর্ণ হলেও, মানবিকতা ও সরলতা আরও বেশি মূল্যবান।

সবশেষে বলা যায়, শিবরাম চক্রবর্তী-এর সাহিত্য শুধু বিনোদনের জন্য নয়; এটি একটি সামাজিক দলিল, যা আমাদের সময়ের অর্থনৈতিক ও সামাজিক বাস্তবতাকে প্রতিফলিত করে। তাঁর লেখার মাধ্যমে আমরা শুধু হাসি না, বরং সমাজ ও অর্থনীতি সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করতে শিখি। তাঁর এই বহুমাত্রিক দৃষ্টিভঙ্গিই তাঁকে বাংলা সাহিত্যের এক অনন্য উচ্চতায় অধিষ্ঠিত করেছে।তাঁর রচনা আজও আমাদের পথ দেখায়;কীভাবে সীমিত সম্পদের মধ্যেও সুখী থাকা যায়, কীভাবে সামাজিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে সচেতন হওয়া যায়, এবং কীভাবে হাসির মাধ্যমে জীবনের কঠিন বাস্তবতাকে গ্রহণ করা যায়। এই কারণেই শিবরাম চক্রবর্তী শুধু একজন সাহিত্যিক নন, তিনি এক গভীর সমাজচিন্তক, যার গুরুত্ব সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আরও বেড়েই চলেছে।

কুরুশ

অয়ন কুমার খাঁ (স্যাক্ট, ইংরেজী বিভাগ)

ধুর শাল্লা!

বিরক্ত মুখে আবার স্কুটারে কিক মারলো বাসব। শীতকাল এলেই, এই এক ব্যাটারি ডাউনের সমস্যা। তার ওপর ওর গাড়িটা সেকেন্ড হ্যান্ড কেনা। আজ সকালে রিতুর ইন্টার্ভিউ আছে বলে, গতকাল বিকেলেই গাড়িতে তেল ভরে রেখেছিল বাসব; আজকে সকালে আবার এই ইগনিশন প্রব্লেম। গাড়িটাকে খানিক হেলিয়ে দুলিয়ে তেল নাড়িয়ে একবার গাড়িটার 'চোখ' বন্ধ করে, ফের টেনে নিয়ে, মা কালীর নাম করে আবার কিক মারলো সে।

যাক বাবা ! হাঁফ ছেড়ে স্কুটারে উঠে ও এগিয়ে গেলো রিতুর বাড়ির দিকে।

অনেকটা লেট অলরেডি ও করে ফেলেছে এই চক্করে। তাড়াতাড়ি না যেতে পারলে সাতটা পঁয়ত্রিশের ডাউন কৃষ্ণনগর লোকালটা মিস হয়ে গেলেই চিড়ের বাইশ ফের। রানাঘাটের যে স্কুলে রিতু চাকরীর দরখাস্ত দিয়েছে, তার হেড অফিস সল্টলেকে। সেখানে আজ সকাল এগারোটায় রিপোর্টিং টাইম। গত দুদিন ধরে সেই নিয়ে বিস্তর দৌড়ঝাঁপ চলছে। আজ কিছুতেই লেট করতে চায়নি ও সে কারণে।

রিতুর বাড়ি পাশের পাড়াতেই। শীতলা মন্দিরের বাঁ পাশে গলিটায় মোড় ঘুরেই বাসব দেখলো বাড়ির দরজায় রিতু আর মাসিমা উদ্বিগ্ন মুখে দাঁড়িয়ে আছেন। হুটোপাটা করে দরজায় গাড়িটা লাগিয়েই বাসব করুণ মুখে তাড়া দিলো,--

উঠে পড়ো, আসলে গাড়িটা....

কপালে দুশ্চিন্তার রেখা রুমালে মুছে, রিতু গাড়ির পিছনে উঠে বসতে, বসতে বললো--

মা, আসছি। চিন্তা করো না, আমি সব মিটলে ফোন করছি। দুপুরে একটু গড়িয়ে নিয়ো ....

রিতুর মা, দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বাসবের উদ্দেশ্যে বললেন --

বাসু, একটু বুঝে শুনে যেও বাবা । হুটোপাটায় বেরোলে.... দুগ্গা দুগ্গা ....

শেষের কথাগুলো শেষ হওয়ার আগে, বাসব ঘাড় নেড়ে রিতুকে নিয়ে খানিক এগিয়ে গেছে। স্টেশনে ঢোকার মুখে জ্যামে আটকালেই আরেক বিপদ। ঠাকুর, ঠাকুর করে কালীনারায়নপুর স্টেশনে ঢোকার রাস্তায় বাঁক নিয়ে, অফিস টাইমের যাত্রী, টোটো , বাইক, ভ্যানের সাথে রীতিমত ধস্তাধস্তি করে কোনো রকমে স্টেশন লাগোয়া গ্যারেজে গাড়িটা দাঁড় করালো বাসব। রিতুকে ইশারায় টিকিটের লাইনে দাঁড়াতে বলে, একছুটে বেরিয়ে পাশের দোকান থেকে কিছু কেক বিস্কুট আর জলের বোতল কিনে ফিরে এলো সে। রিতু টিকিট হাতে বাসবের পাশে এসে দাঁড়াতেই এক নম্বর প্ল্যাটফর্মে হুড়মুড় করে ট্রেন ঢুকে পড়লো।

ঘড়ির কাঁটায় বাঁধা পড়া মানুষের মধ্যে , ঠেলেঠুলে কোনো রকমে নিজেদের খাপ খাইয়ে ওরা উঠে পড়লো একটা কামরায়। দুটো সারির আসনের মাঝে এসে ওরা দাঁড়াতেই, রিতুকে বসার জন্য জায়গা করে দিয়ে দু নম্বর সিটের এক বয়স্কা মহিলা বললেন,

- তুমি বসো, আমি এই রানাঘাটেই নামবো।

যাক বাবা, বাসব মনে, মনে ভাবলো, একেই বলে মেঘ না চাইতে জল। সকালবেলা নিজের কপালকে গালি গালাজ করার জন্য, হয়তো এটা একটা ক্ষতিপূরণ।

সকাল থেকে এই প্রথম বাসব একটু শান্ত হয়ে দাঁড়ানোর সময় পেলো। রিতুর মুখটা একটু গম্ভীর আর শুকনো

লাগছে। সকাল থেকে ভালো করে কথা বলার অবকাশ হয়নি ওর সাথে। একটু লেট করে ফেলার জন্য খানিকটা গ্লানিও হচ্ছে বাসবের মনের মধ্যে। এমনিতেই রিতুর ইন্টারভিউয়ের টেনশন, তারপর ওর কারণে যদি সেটা বাড়ে, তা মোটেই কাজের কথা নয় ; অন্তত আজকের জন্য।
হালকা বেগুনী রঙয়ের সুতির শাড়ির সাথে কালো একটা ব্লাউজ পড়েছে রিতু। সাদা পাতলা চাদরকে অদ্ভুত কায়দায় গলা ও শরীরের অর্ধেক অংশে জড়িয়ে রেখেছে। ওর আলগোছে করা খোঁপাটায় ক্র্যাচার দেখেই বাসব বুঝতে পারলো , রিতু খুব তাড়াতাড়ি রেডি হয়েছে। সরু কাজল আর হয়তো ঠোঁটে একটু ভেসলিন। ফুল ছাপা একটা সুতির ব্যাগ আর হাতে ছোট ডায়ালের ঘড়ি ...
এতো অল্প সময়ে এত খুঁটিয়ে দেখার জন্য নিজেকেই মনে , মনে শাসন করলো বাসব। কথা শুরু করার জন্যই আমতা, আমতা করে রিতুকে বললো,
- ইয়ে, মানে, সকালে খেয়ে বেরিয়েছিলে ?
রিতু গম্ভীর মুখেই পাল্টা প্রশ্নে উত্তর দিলো,
- হুট করে আমাকে টিকিটের লাইনে দাঁড় করিয়ে কেক বিস্কুট কিনতে গেলে কেন ? মা তো রুটি তরকারী সেই কোন ভোর বেলাতেই করে রেখেছে।
অবাক হয়ে বাসব জিজ্ঞেস করলো,
- আমি খাবার কিনতে গেলাম, জানলে কি করে? আমি তো বাইরের দোকানে গিয়েছিলাম....
রিতু কোনো উত্তর দিলো না, একবার আলগোছে চাইলো বাসবের দিকে। সেই চাউনির ইশারায়, বাসবের আলমারির সারগোফেগাসে , হলুদ হয়ে যাওয়া ডায়েরীর পাতায় শুয়ে থাকা কবিতার মৃতদেহরা আবার দিনের আলো দেখতে চায়....

"মন খারাপের বৃষ্টি হলে
ঝরা বকুলের গন্ধ কুড়িয়ে আনতে,
আমিও তোমার প্রেমিক ছিলাম
সত্যি বলো, জানতে..... "

কালীনারায়নপুরের বাদুড়তলা বাজারে বাসবের একটা চায়ের দোকান আছে। বাসবের বাবা বেঁচে থাকতে, ছোট থেকেই ওকে এ দোকানে প্যালা দিতে হয়েছে। বাসবদের মতো পরিবারে পড়াশোনার চল টা ওই গড়িয়ে , গড়িয়েই চলে। বাসব পড়ালেখায় খুব খারাপ ছিলো না, তবু ওর বাবা তেমন উৎসাহ পাননি ছেলেকে উচ্চ শিক্ষায় পাঠাতে। কারণ দুটো খুব চেনা - এক তো খরচ, আর দুই , এই দোকান দিয়েই যখন চলে যাচ্ছে, তখন আর অন্যদিকে এগিয়ে লাভ কি। সাহিত্য বরাবরই বাসবের পছন্দের বিষয় ছিলো। রানাঘাট কলেজে, বাংলা বিভাগে ভর্তি হয়ে , বাবা মারা যাওয়ার পর, দোকানের হাল পুরোপুরি ধরতে গিয়েই , পড়াশোনাটা আর শেষ করতে পারেনি। তাও এখনো সময় সুযোগ হলে চায়ের দোকানের ফাঁকা বেঞ্চে বসে, বা রাতের নিঃসঙ্গ বিছানায়, কাছে টেনে নেয় তার বিলাসিতার একমাত্র সঙ্গী, সাহিত্যকে।
বাসবের মা, ছোটবেলাতেই গত হন। দাদা আর বৌদির সংসারে বাসবের পরিস্থিতি অনেকটা খুচরো পয়সার মতো; পকেটে রাখতে অস্বস্তি হয়, কিন্তু দরকার - অদরকারে কাজে লাগে।
দাদা আর বাসবের বয়সের প্রায় এগারো বছরের ফারাক। দুই ভাইয়ে বয়স আর চিন্তার ব্যবধানের দুর্লঙ্ঘ্য পাঁচিলের , বৌদি নিয়মিত তদারকি করেন। ফলে, বাসব তার যৌবনের মাঝপথে এসে পৌঁছে যাওয়ার পরও , তার সংসারের

জন্য আলাদা করে আর কাউকে তৎপর হতে হয়নি। সামান্য রোজগার, আর সাংসারিক জটিলতার কারণে ক্লান্ত হয়ে, বাসব নিজেও আর বিয়েতে তেমন উৎসাহ বোধ করেনি কোনোদিনই।

কিন্তু, যে কথাগুলো আর কাউকেই বলা হবে না, সেই সব কথাদের খুব যত্ন করে বাসব সেই কিশোরবেলা থেকেই গুছিয়ে রেখেছে তার ডায়েরীর পাতায় , সে অন্তমিল থাক, বা, না থাক। তারা কোনোদিন মাথা তুলে কবিতা হওয়ার স্পর্ধা দেখাবে কিনা বাসব নিজেও জানে না, ও শুধু জানে, শিল্পীর বুকের পাঁজরের হাড়ে ফুটো থাকে বলে, সেখান থেকে বাঁশির সুর বের হয়। অনন্ত দুঃখের সাথে আজন্ম সহবাস করতে,করতে বাসব বুঝতে পেরেছে বুড়িয়ে যাওয়ার চেয়ে ফুরিয়ে যাওয়া কত অনায়াস....

তবুও জীবন, মানুষকে কান ধরে টেনে নিয়ে যায় দিকশূন্যপুরের দিকে।

রিতুর বাবা , বাসবের বাবার দোকানে বিকেলের নিয়মিত চায়ের খদ্দের ছিলেন। হেমন্তের কোনও এক বিকেলে , দোকানে আসার সময়, ওর বাবার সাথে প্রথমবার সে রিতুকে দেখে। তারিখের ভীড়ে মুহূর্তরা শুকিয়ে আসে বটে, কিন্তু মনে দাগ থেকে যায়। বাসবের মতো ছেলেরা অযত্নে অবহেলায় বড়ো হয় বলে , তারা ঝোপঝাড় গুল্মের মতো শুধু নিজেকে সমর্পণ করে আঁকড়ে বেঁচে থাকতে চায়। বাসবের এই পর্ণমচি জীবনের শুষ্ক ডালপালায় , রিতুর জন্য কিছু চিরহরিৎ ইচ্ছে ফুটে ওঠার আগেই, বাসব তার বাবার হাতে দেখেছিল রিতুর বিয়ের কার্ড। সময় যত সানাইয়ের বিলম্বিত লয়ে তাল ঠুকে ঠুকে এগিয়েছে, বাসব বুঝেছে, 'সে' বা, 'তারা' সবাই 'কিনু গোয়ালার গলির ' হরিপদ কেরানীর সহোদর, যারা ভালোবাসা ছাড়া, আর কিচ্ছু না চাওয়া সত্ত্বেও পৃথিবীতে ফিরে আসে শুধু বারবার মরবে বলে....

" লোকের ভীড়ে হারিয়ে যাওয়ার আগে
পিছন ফিরে তাকাই কেন জানিস...
মায়ার ক্ষতেও আল্পনা আঁকা যায়,
শুধু, অদৃষ্ট বড়ো সুযোগের সন্ধানী ... "

চাকরীটা রিতুর সত্যিই খুব দরকার।

রিতুর মাস্টার্স শেষ হওয়ার আগেই, মারণ রোগ বাসা নিয়েছিল ওর বাবার শরীরে। ভবিষ্যতের আঁচ বুঝেই মেয়েকে তড়িঘড়ি পাত্রস্থ করতে চেয়েছিলেন তিনি। সঞ্জয় একটি সরকারি সংস্থায় কেরানীর পদে ছিলো। স্থায়ী চাকরী, আর ছিমছাম , কাছাকাছি পরিবারে সম্পর্কের সুতোয় গিঁট পড়তে পড়তে সময় লাগেনি। সাধারণত ভালোবাসার সম্পর্ক মায়সুতোয় বোনা হয় বলে, তার বুননে প্রাথমিক জটিলতা থাকলেও, এক সুতোর টানে তা ফরফর করে খুলেও আসে। কিন্তু, সমাজপতিরা এমন নিদান, বিয়ের বেলায় দিয়ে রেখেছেন, না ছিঁড়লে সে গিঁট খোলা বড়ো দুষ্কর।

প্রায় দশ বছর ভালোবাসাহীন , গতানুগতিক অভ্যাসের মতো দাম্পত্যে ইতি টেনে , নিঃসন্তান রিতুকে হঠাৎ একদিন বিদায় না জানিয়ে, সঞ্জয় ঠিকানা বদলে চলে গেলো না ফেরার পিনকোডে। সঞ্জয়ের পরিবারে রিতু ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো হয়ে বেঁচেছে এ দেশের আর পাঁচটা ঘরোয়া বউয়ের মতো। সঞ্জয় চলে যাওয়ার পর, ওর বাবা-মা, রিতুকে মুখে কিছু না বলেও একটা নিঃসন্তান, সদ্য বিধবাকে, কত সহজে বাড়ি - সম্পত্তি থেকে বেদখল করা যায়, তা হাতে কলমে করে দেখিয়েছিলেন বলেই, আজ প্রায় দু বছর সে আবার তার বিধবা মায়ের আঁচলে ফিরে এসেছে।

বাবার করে যাওয়া এম আই এসের , সামান্য সুদের টাকায় বৃদ্ধা মায়ের শরীরের সব ঠিকানায় ওষুধ পৌঁছানো যায় না। রিতু বেশ কিছু টিউশন করলেও কিছুতেই মাসের শেষে কুলিয়ে উঠতে পারছিলো না। সেসময় রানাঘাটের এই বেসরকারি স্কুলটায় দরখাস্ত করে, প্রাথমিক পর্যায়ে মনোনয়ন পেয়ে যায় রিতু। এরপর বিশেষ পর্যায়ের পার্সোনালিটি টেস্ট, অভিজ্ঞতা এইসব দেখা হবে।

দায় আর দায়িত্বের চক্রব্যূহে , তলিয়ে যেতে, যেতে আবার যেখানে, বাসব আর রিতুর দেখা হয়েছিল, তাদের অজান্তে সেখানে একটা আলাদা বিশ্বের মানচিত্র আঁকা থাকে। মিলিটারী বুটের শাসন, আর নীতিপুলিশের চোখ রাঙানি উপেক্ষা করে, বয়স - শ্রেনী - দেশ - ধর্ম - বর্ণ - ভাষা - লিঙ্গের ঊর্ধ্বে উঠে, মানুষ সেখানে মানুষের পাশে দাঁড়ায়। খাপ পঞ্চায়েতের আধলা ইঁটের আঘাতে রক্তাক্ত হয়েও পাড়ার দেওয়ালে মানুষ কবিতা লিখে আসে,

''কৃষ্ণচূড়ায় আকাল দেখে, দুঃখে মানুষ কাঁদবে কবে,
হাজার বারণ সরিয়ে দিয়ে, ভালোবেসেই পাগল হবে।"

- ও দাদা , একটু ব্যাগটা ওপরে রাখুন তো...

চিন্তার অতল থেকে সম্বিত ফিরে পেয়ে বাসব হাত বাড়িয়ে তার সহযাত্রীর থেকে ব্যাগটা নিয়ে ওপরের বাঙ্কে তুলে দেয়। রিতু ঘুমিয়ে পড়েছে ট্রেনের দুলুনিতে। সোদপুর ঢুকছে, এতক্ষণে একজন, জানলার ধার থেকে উঠে রিতুর পাশে বসার জায়গা ছাড়লো বাসবকে। এখনও মিনিট কুড়ি লাগবে শিয়ালদা ঢুকতে। শিয়ালদা থেকে মেট্রো করে সেক্টর ফাইভ মিনিট তিরিশ লাগার কথা। মনে, মনে টাইমের হিসেবটা করে নিলো ও । চটক ভেঙে রিতু ক্লান্ত গলায় বাইরে তাকিয়ে বললো,

- সোদপুর... একটু জলের বোতলটা দাও তো।

বাসব নিজের ব্যাগ থেকে নতুন কেনা প্লাস্টিকের বোতলটা বের করে এগিয়ে দিলো রিতুর দিকে। এই ফাঁকে রিতুকে জিজ্ঞেস করলো,

- টেনশন হচ্ছে না তো, সব কাগজ গুছিয়ে এনেছো ?

জল মুখে গাল ফুলিয়ে রিতু সম্মতির ঘাড় নাড়লো।

চিরকাল বাসব আর রিতু দুজনেই মুখচোরা বলে, কথায়, কথায় আড়ষ্টতা এসে যায় ওদের মধ্যে। আসলে সম্পর্কের সমীকরণ না মেলা পর্যন্ত বোধহয় কোনো মানুষই স্বাভাবিক থাকতে পারে না নিজেদের ব্যবহারে একে অপরের সঙ্গে।

সাপ - সিঁড়ির লুডো খেলার রোমাঞ্চ , বাসবের মতো মানুষরা ছোট থেকেই এড়িয়ে চলে। শুধু ওই রংচঙে সাপ গুলোকে দেখে গা শিউরে ওঠে তার জন্য নয়। বরং, বার ,বার সিঁড়ি প্রাপ্তির আনন্দের পর, হঠাৎ সাপের মুখে তলিয়ে যাওয়ার শিহরণ ক্লান্তিকর লাগে বলে। তার চেয়ে বাসব বেছে নেয়, লাল - নীল - সবুজ - হলুদের খোপ বন্দী জীবনের নির্ভরতাকে। ছক্কা - পুটের মাঝে, যা দুই - তিন - পাঁচের দিন আনি - দিন খাওয়া জীবন পড়ে থাকে, সেটুকুকে নিয়েই বার বার ছোট্ট কৌটোয় ঘুঁটি ঝাঁকিয়ে উল্টে দেখতে গিয়েই এক, এক করে, ত্রিশটা বছর পার করে ফেললো সে।

রিতুর এ বাড়ি ফিরে আসার কয়েকমাস আগে , একদিন বাজারে, প্রেশার কমে গিয়ে রিতুর মা অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। প্রাথমিক চিকিৎসা করিয়ে, সেযাত্রা বাসবই তাঁকে বাড়ি পৌঁছে দিতে এসেছিলো। খানিকটা পূর্ব পরিচিতির কারণে, আর কিছুটা কৃতজ্ঞতায়, সেদিন রিতুর মায়ের কাছে সে প্রথমবার ভিতরে আসার ডাক পায়।

রিতুর বাড়ি দেখার জন্য কোথাও একটা ঘুমোনো ইচ্ছে লুকিয়ে রেখে, মুখে অন্তত পাশ কাটাতে গিয়েছিল বাসব কাজের ছুতোয়। রিতুর মায়ের জোরের সামনে, সে আপত্তি দাঁড়ায় নি। সহায় সম্বলহীন বয়স্কা বিধবাদের কাছে, বাসবের মতো ছেলেরা খরকুটো। মাতৃহীন বাসব আর মাতৃসম অসুস্থ মহিলার মধ্যে অল্পদিনেই সেতু জুড়ে গিয়েছিল এসব জাগতিক স্বার্থের কথা না ভেবেই। এর মধ্যে হঠাৎ একদিন রিতুর ফিরে আসা......

জীবন এভাবে স্থবির হয়ে গেলে , আর ক্যালেন্ডারের পাতা ওল্টানোর খুব একটা প্রয়োজন হয়না। রিতুর পরিবারের সংক্ষিপ্ত পরিধির বৃত্তে, তাই খুব সহজেই বাসব এঁটে গিয়েছে বাসুদা হয়ে।

মুঠোফোনের হরেকরকম্বায়, আজকাল আর এসব ছাপোষা বিষয়ে কানাকানি করতে মানুষের রুচি কমে গিয়েছে। যতক্ষণ না কোনো সম্পর্কের গা থেকে আঁশটে গন্ধ ছাড়ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত সমাজের এসব মশামাছিদের থেকে, উতপাতের ভয় নেই। তবে, অতিসন্ধিৎসু মানুষেরা চিরকালই পিশাচ হয়ে মানুষের ভিড়ে লুকিয়ে থাকে, ছুতো পেলেই ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ার অপেক্ষায়। চায়ের দোকানে মানুষ চড়িয়ে খায় বলে, বাসব এদের আলাদা করে চিনতে পারে। রিতুর সাথে এই নামহীন সম্পর্ক , তাই বাসু ধরে রাখে, পদ্মপাতায় জলের মতো করে। সেরকম একটা অছিলা আজকের দিনটা ...

''এখন এসে খবর নিলে,
তোমার হাতে মরতে রাজী নাকি....
বাঁচতে যখন ইচ্ছে হলো
কফিনে শুধু পেরেক পোঁতা বাকি ।''

শিয়ালদা নেমেই, বাসব - রিতু হুড়মুড় করে ভিড় ঠেলে এগিয়ে গেলো শিয়ালদা দক্ষিণের দিকে। মেট্রোর সিঁড়ি দিয়ে নেমে টিকিটের লাইনে দাঁড়িয়ে বাসব আরেকবার দেখে নিলো হাতঘড়িটা, মিনিট দশেক দেরী ১০ টা বাজতে। মনে, মনে ভাবলো আরেকটু সময় নিয়ে বেরোলেই ভালো হতো। একদম ডট টাইমে গিয়ে পৌঁছালে, জায়গাটার পরিবেশের সাথে, রিতু একটুও ধাতস্ত হওয়ার সুযোগ পাবে না। যাক, আর কি করার আছে ... টিকিট নিয়েই ওরা দুজন একস্ক্যালেটরে নেমে এলো মেট্রোরেলের নির্দিষ্ট প্ল্যাটফর্মে। এদিকে বড়ো একটা আসা হয়না বলে, বাসব আগে থেকেই রাস্তার খুঁটিনাটি জেনে রেখেছিল ওর পরিচিত এই লাইনের যাত্রীদের থেকে।

সেক্টর ফাইভের মেট্রো স্টেশনের বাইরে এসে, অটোয় চড়ে ওরা যখন নির্দিষ্ট গন্তব্যে পৌঁছালো তখন প্রায় এগারোটা।

একটা বিশাল কমপ্লেক্সের মধ্যে অনেক অফিস। এদিক সেদিক সুসজ্জিত বিল্ডিং ছাড়াও, ক্যাফেটেরিয়া , সুসজ্জিত লন , সুইমিং পুল , সুবেশা নারীপুরুষের সুগন্ধ যেন জায়গাটাকে, একটা মফঃস্বলীয় স্বপ্নপুরী বানিয়ে রেখেছে। এই জগতে, বাসবের মতো মানুষরা বাস্তবে এসে বারবার হোঁচট খায়।

নির্দিষ্ট অফিসের লাউঞ্জে পৌঁছে, সব ডকুমেন্টস ভেরিফাই করে, রিতুকে যেতে হলো ফোর্থ ফ্লোরে। বাসবের সেখানে যাওয়ার অনুমতি নেই বলে, তাকে অপেক্ষা করতে হলো গ্রাউন্ড ফ্লোরেই। একটা বিরাট ঘরের মধ্যে একদিকে শুধু একটা রিসেপশন , আর মাঝখানে কয়েকটা সোফা রয়েছে অপেক্ষমান মানুষদের বসার জন্য। অদ্ভুত নীরবতায় ঘরটাকে আরও শূন্য মনে হয়। বাসব একটা কোণায় , যেখানে সবচেয়ে বেশী করে নিজেকে গুটিয়ে রাখা যায়, তেমন একটা সোফায় গিয়ে বসলো। এমন জায়গায় বাসবের এই প্রথমবার আসা। যদিও শীত এখনো তেমন জাঁকিয়ে বসেনি , তাও এই দুপুর বেলাতেও ভিতরে ভিতরে অদ্ভুত এক শীতলতা অনুভব করতে পারছিলো ও। যখন কিছুই করার থাকে না, তখন মানুষ ঠিক করে তার চারপাশকে দেখতে শুরু করে । এতো

বড়ো একটা ফাঁকা ফ্লোর দেখে, তাই প্রথমেই বাসবের মনে হলো, সে যে ঘরটায় থাকে, এই জায়গাটা অন্তত তার থেকে একশো গুন বড়ো। বাসবের ঘরে যদিও আসবাব বলতে, একটা চৌকি, জামাকাপড় রাখার জন্য রট আয়রনের আলনা-কাম আলমারী, আর পড়ার জন্য একটা টেবিল-চেয়ার , তাতেই বাসবের নিজের ঘরটা বড্ডো ছোট হয়ে যায় । এরা এতো বড়ো জায়গা রেখেছে শুধু অপেক্ষার জন্য ....

বাসব ছোটবেলায় শুনতো, ‘ যদি হও সুজন, তেঁতুল পাতায় ন জন ...’ এদেশের কত - কত মানুষ , একটা বারো বাই চোদ্দোর ঘরে তাদের একান্ত গোপনীয় মুহূর্তগুলো ভাগযোগ করে গোটা জীবন কাটিয়ে দেয়, আর কিছু মানুষ স্পেস সচেতনতার দোহাই দিয়ে আশ্রয় নেয় একাকীত্বের কোটরে। এখানে আসার সময় , বহুতল বিল্ডিংগুলো দেখে, বাসবের মনে হচ্ছিলো, মৌমাছির চাক ; প্রত্যেকের প্রকোষ্ঠ নিজস্বতার মধুতে পরিপূর্ণ। কিন্তু , বাসব কোথাও শুনেছিলো , ‘ একটি শিশুকে মানুষ করতে, একটা গোটা গ্রামের প্রয়োজন ‘ - এই প্রবাদ কি তাহলে প্রযোজ্য নয় ‘ শহুরে ‘ মানুষের জন্য ?

রিতু আর বাসবের মাঝেও আছে, ‘ দুর্গম গিরি, কান্তার মরুর ‘ দুর্লংঘ্য সীমারেখা। বাসব, কল্পনায় সে কাঁটাতার বহুবার পেরিয়ে এলেও, সে জানে, বাস্তবে তা পেরোনোর মাশুল দেবার অর্থ তার পকেটে নেই। আর নেই বলেই, রিতু - বাসবদের মতো মানুষকে এসে বারবার কড়া নাড়তে হয়, এই মহানগরের সুবিশাল কাঁচের বাড়িগুলোর দরজায়। এই অফিসগুলোয়, মানুষের মানুষ থাকার যাবতীয় অধিকারগুলো খুব সস্তা দরে নিলাম হয় । পিঁপড়ের মতো কিছু মানুষ, কলকাতার আশেপাশের গ্রাম, আধা-গ্রাম থেকে ভোরবেলার ট্রেনে , বেড়ালের মুখে করে নিয়ে যাওয়া বাচ্চার মতো, ঝুলতে , ঝুলতে আসে, মাসের শেষে খুঁদকুড়োর আশায়।

এমন কিছু মানুষ , আসা-যাওয়ার মাঝে , বাসবের দোকানের চা - সিগারেটের খদ্দের। তাদের দেখে বাসবের মনে হয় , একটা মেশিনের যন্ত্রাংশের মতো - যারা জানে না মেশিনের কাজ কি ...

রিতুও হয়তো একদিন মিশে যাবে এরকমই যন্ত্রাংশের ভিড়ে, তখন আর রিতুকে চেনা যাবে না আলাদা করে। তাও , বাসব মন প্রাণ দিয়ে চাইলো, যেন রিতুর চাকরিটা হয়ে যায় - এছাড়া আর অন্য পথ বন্ধ বলেই।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে, বাসব দেখলো প্রায় দেড় ঘণ্টা পেরিয়ে গেছে। ব্যাগ থেকে জলের বোতল বার করে খেতে , খেতেই দেখলো, ফাইলটা বুকে চেপে নিয়ে রিতু আসছে। বুকের মধ্যে, পাওয়া, না-পাওয়া , আশা - নিরাশার যে ঢিবঢিবানি শুনতে পাওয়া যায়, সেটাও কি স্ফিগমোম্যানোমিটারে দেখে ডাক্তাররা মাপতে পারে ....

রিতুকে আসতে দেখে জলের ঢোক গিলে, বাসব উঠে দাঁড়ালো । রিতুর মুখ দেখে, বাসব বহুবার ওর মনের ভাব পড়তে গিয়ে দেখেছে, এই ভাষাটায় ওর অক্ষমতা কতখানি। এবারেও তাই কথা খুঁজে না পেয়ে জিজ্ঞেস করলো,

- কি হলো ?

উত্তরে, রিতু আবারও প্রশ্ন ছুড়ে বললো ,

- তোমার কি ফেরার তাড়া আছে ?

বাসব থতমত খেয়ে জিজ্ঞেস করলো,

- কেন, এখন থেকে আবার কোথাও পাঠাবে নাকি ?

রিতু খানিকক্ষণ চুপ থেকে বললো,

- জানি না, চলো।

বাইরে বেরিয়ে বাসব অটো খুঁজতে লাগলো। অফিস টাইম পার হয়ে গেছে বলে, একটু ফাঁকা মনে হলো রাস্তাঘাট।

রিতুকে এই ফাঁকে জিজ্ঞেস করলো,

- ক্ষিদে পেয়ে গেছে তো? এখানে তো দোকান সেরকম....

খাবার দোকানের অভাব, সেই অফিস কমপ্লেক্সের মধ্যেও ছিলো না। সেইসব রেস্তোয়ার বিজ্ঞাপনের ছবিতে যেসব মানুষদের হাসিমুখ দেখা যায়, তাদের সাথে বাসব রিতুদের মুখের কোনো মিল থাকেনা। বাসব খেয়াল করে দেখেছে, বিভিন্ন সরকারী প্রকল্পের বিজ্ঞাপনের ছবিগুলোয় দেখতে পাওয়া মানুষগুলোর সাথে, বেসরকারি বিজ্ঞাপনের মুখগুলোর বিস্তর ব্যবধান রয়েছে। বাসব এর মাঝের তত্ত্বটা খুব ভালো করে না বুঝলেও, এটা ধরতে পারে , রাজনৈতিক নেতারা ভাষণ দেওয়ার সময় যে উন্নয়নের রংধনু আঁকেন, তাতে আখেরে ওই বেসরকারি বিজ্ঞাপনের উজ্বল মুখগুলো আরও বেশী করে আলোকিত হয়। সাদা আর কালোর মধ্যে যে কোটি, কোটি ভারতবর্ষ রোজ নুন আনতে পান্তা ফুরোয়, সে খবর খবর ওয়ালাদের প্রাইম টাইমে বেশীদিন ঠাঁই পায়না।

রিতু বাসবের উৎকণ্ঠিত মুখের দিকে চেয়ে হঠাৎ বললো,

- তুমি বললে না তো ফেরার তাড়া আছে কিনা ...

বাসব আবারও প্রতিপ্রশ্ন এগিয়ে রিতুকে বললো,

- তাড়া কেন থাকবে ? তোমার কাজটা তো আগে... মানে, এলাম যখন সব মিটিয়েই ....

বাসবের থেকে মুখ ফিরিয়ে রিতু হঠাৎ বললো,

- আমায় কোথাও চা খাওয়াবে বাসুদা ?

অচেনা মানুষের ভীড়ে, চেনা মানুষেরা একে অন্যকে চেনার সুযোগ পায় বেশি। শিয়ালদা স্টেশনে, তখন শীতের বিকেলে ট্রেন ধরতে চাওয়া ছুটন্ত মানুষের সাথে পাল্লা দিয়ে সন্ধ্যে নামছে ।

এই অবকাশে , স্টেশনের ফ্লাই ওভারের তলায় এককাপ চায়ের ধোঁয়াকে সাক্ষী রেখে বাসব আর রিতু এগিয়ে গেলো অনন্তলোকের দিকে।

‘‘কেউ কোথাও জানবেনা কোনোদিনই,
তারারাও নাকি কানাকানি ভয় পায়,
অমলতাস আর কালকাসুন্দা বনে
দুঃখেরা ফোটে, বারবার ঝরে যায়।”

মা

স্বাতী চক্রবর্ত্তী (স্যাক্ট শিক্ষিকা, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ)

তুমি আছো মা
তাই তো এই পৃথিবী এতো সুন্দর,
এই প্রকৃতি এত অপরূপা,
অনুপমা-তোমার ক্রোড়ে, জন্ম মাগো-
তোমার হাত ধরে পথ চলা
তোমার মুখে মুখ রেখে, আধো-আধো কথা বলা
তোমার স্নেহের চাদর বিছিয়ে রেখেছ মাগো-
মোদের তরে
যেমতি অশ্বত্থ বৃক্ষ তপ্তরৌদ্রে প্রশান্তি দান করে
ক্লান্ত-শ্রান্ত আশ্রিত পথিকজনেরে
মাগো, তুমি যেন উদীয়মান প্রভাকর
তোমার দীপ্তিময় ছটায় প্রস্ফুটিত মোদের জীবনরেখা
তুমি যেন সেই জ্যোৎস্নালোকিত রাত্রির মোহময়ী চন্দ্র
যার কুন্ডলিনী রূপাঞ্জনায় সুস্নাত সমগ্র বিশ্বপ্রকৃতি।
কতশত হুন, পাঠান, ইংরেজ-এর দল রক্তাক্ত করেছে তোমায় মাগো
কত লাঞ্ছিত, গঞ্জিত হয়েছ তুমি
তবুও বধিতে দাওনি তুমি তোমার শত সহস্র সন্তানেরে
বর্গির দল তোমার পদাঘাতে আজ পদানত,
কালের গর্ভে, চিরতরে বিলীন।
তুমিতো মা সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর-স্বরূপা,
কার এতো স্পর্ধা, কে রোধে তোমায়-তুমি যে বিদ্যুৎ প্রভা,
তোমার প্রভার বিচ্ছুরণে ছারখার সকল কুচক্রীর দল।
ধন্য মাগো-
তুমি রবে সরবে মম চিত্তে
তব শাশ্বত অম্লান চির-ভাস্বর রূপে।।

অ্যাড-হক কথা

অনির্বাণ ভট্টাচার্য (ইংরেজি বিভাগ)

মাথার ভেতর কেবলই ঘুরছে এই কথাগুলো। শরীরের টানাটোনাতেও। শান্তিপুর লোকালে বসে বসে লিখছি, এলোমেলো ভাবনা, গরম গজা বিক্রি করছে ধিলু, আমরা মাঝে মধ্যে ওর গজা খাই, আজ খরিদ্দার নেই, সেইরকম গরম, গজা নয়, হাওয়া। কথা হল, পড়াশুনোর জগতে ভরপুর সেঁধিয়ে থাকা মানুষেরা কেন সহজে সবকিছু বুঝে ফেলতে চান? যেখানে চিন্তার স্বাভাবিক ও নিজস্ব জটিলতা আছে, সেখানে ধ্যান দেবার ব্যাপার আছে, আছে প্রস্তুতি ও পরিশ্রমের শীলন ও যত্ন, সেখানে কিছুতেই তাঁরা এনগেজ করতে চান না। গতকাল একটা ধাক্কা খেয়ে আবার টের পেলাম। যে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক প্রায় ১৫-১৭ বছর আগে আমার পাঠ করা একটা পেপার শুনে বলেছিলেন, মাথায় থান ইট মেরে গেলি, গতকাল আমারই একটা লেখা শুনে তাঁর সেই একই পুনরুক্তি! মাঝখানে ওঁর সঙ্গে বহুবার দেখা হয়েছে, কিন্তু পড়াশুনোর কোনো কথা হয় নি, যেমন হয় না। আমাদের এই চত্বরের কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে এরকম লোকজন বোঝাই। তাঁদের মনোভাবটা এরকম যে, এরা কী দর্শন, তত্ত্ব চর্চা করে, ক্লাসে কী পড়ায়, বুঝিনা কিছু! পড়াশুনো ছেড়ে দিয়েছেন অথচ বিদ্যায়তনিক ক্ষেত্রের মাথায় বসে আছেন, এইরকম ভূষিদের মধ্যিখানে আমাদেরকে এলিয়েনেট করতে এঁরা পারঙ্গম। চিন্তার পরিশ্রম, বোঝার হয়রানি বলতে যা বোঝায়, তার কিছুমাত্র এঁরা প্র্যাকটিস করেন না, করতেই চান না। তাই আমরা যারা একটু চেষ্টাচরিত্ত করি, তাদের পাওনা হয়, কী ইট ছুড়লি, ঢুকলো না, মানে ঘুরিয়ে বললে, মানে দাঁড়ালো না কোনো। অথচ সাহিত্যের, বিশেষত ইংরেজি ভাষা সাহিত্যের এই ফিটবাবু ফিটবিবিরা ইংরেজিয়ানা দেখাতে কিন্তু ভয়ানক ওস্তাদ।দেখুন, আমরা গ্রামের ছেলেপুলেরা ক্লাস ফাইভে উঠে ইংরেজি শেখা শুরু করেছি, এটাই দস্তুর ছিল, ক্লাস এইটে উঠে সেই অর্থে গ্রামার, টেক্সট বইয়ের বাইরে ইংরেজিতে কোনো গল্প উপন্যাস গ্র্যাজুয়েশনের আগে কখনও পড়িনি, বাংলায় যদিও কিছু পড়েছি। ইংরেজির চলও ছিল না, বোধও ছিল না, বলতেও শিখিনি তখন, কলকাতার কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি পড়তে ভর্তি হব, এসব মাথায় আসেইনি। বাড়ির পাশে খাল, বিল, মাঠ, পুকুর, দখিনি হাওয়া, ছেলেপুলে, মারামারি, ডিম খিচুড়ি, চানাচুর মুড়ি, ক্যারম, প্লাস্টিক বল, টুর্নামেন্ট, জনা বিশেক ছেলে একটাই ফুটবল লাথানো, এইসবই ছিল জীবন। স্কুলের ইংরেজির মাস্টারেরা বাংলায় পড়াতেন। তাঁদের কাছেই বাক্যগঠন, প্যারাগ্রাফ রাইটিং শেখা। বেড়ে লোকজন ছিলেন সব। এর মধ্যেই অংকে একশোয় একশো, বিজ্ঞানে আটানব্বই, ইতিহাস ভূগোল বাংলায় ফাটাফাটি। অনেকেই এরকম ছিল গ্রাম মফস্বলের স্কুলগুলিতে। ইংরেজি সাহিত্য নিয়ে ছিল একটা গভীর আগ্রহ, কিন্তু ওই গ্রামার, প্যারাগ্রাফ, খুব বেশি হলে গান্ধির অটোবায়োগ্রাফি, কিংবা রাজাগোপালাচারির রামায়ণ মহাভারতেই আমাদের দৌড়ের মদিনা। ১৮-১৯ বছর বয়স পর্যন্ত এরকমই চলেছে। ইংরেজি নিউজ, টক শো কিংবা সিনেমা দেখা হয় নি কখনো, সে সংস্কৃতিই ছিল না, আরও প্রত্যন্ত গ্রামে তো সেসবে অনাগ্রহ, নির্বিকার ঔদাসীন্য। তারও যথার্থ কারণ অবশ্য আছে। তারপর গ্রামের কলেজেই ইংরেজি পড়তে গিয়ে থার্ড ইয়ারে এসে একদম নিজে নিজে পিটার ব্যারি, হ্যারল্ড ব্লুম, টেরি ইগলটনের ইন্ট্রোডাক্টরি লিটারারি থিয়োরির বই পড়া শুরু, শিক্ষকেরা একটু আধটু বাহবা দিতেন, কিন্তু কোনো সিরিয়াস এনগেজমেন্ট লক্ষ করি নি। এখনও যেমন করি না। একই শিক্ষক, বিশ বছর আগে যে জায়গায়, আজও ঠিক একই জায়গায়, চিন্তার পরিশ্রম থেকে দূরে, বহু দূরে, একই সিলেবাস, একই কথা, শুধু পুনরুক্তি, কোনো ছেদ নেই, আশ্চর্য হওয়া নেই, ভয়াবহ রকমের রিপিটিশন। আমি প্রায় ১০-১২ বছরের ব্যবধানে আমাদের এখানকার এক

নামকরা শিক্ষকের একটি সেমিনার বক্তৃতা শুনতে গিয়েছিলাম, সেই একই অ্যাকসেন্ট, একই ঢং, একই চলে একই কথা। খুব মজা পেয়েছিলাম। খুব হতাশও হয়েছিলাম। প্রথম প্রথম ওঁর পড়ানোয় আশ্চর্য পুলকিত হতাম, কথা নকল করতাম, কিন্তু বহুদিন পর নতুন করে শুনতে এসে সেই মোহের যথার্থ মুক্তি হল। আমাদের ইংরেজিয়ানা ব্যাপারটাই আসে না, দাঁত, হাসি, চুলের কাটিং, গায়ের গন্ধ, হাঁটা, বসা, জামা, জুতো, ফচকেমি সব কিছু স্পেস ডিটারমিন্ড। পায়ের বালি ছাড়ানো যায় না কিছুতেই। চিন্তার পরিশ্রম ও পাঠের প্রস্তুতি কিন্তু নিরবিচ্ছিন্ন। এমন একটা সময়ের অসংগত দাবিতে আমরা আটকে পড়েছি যে এই অনুশীলন ধীরে ধীরে যেন গুরুত্বহীন হয়ে পড়ছে, পড়াশুনো যে নীরবে নিভৃতে একটা সুস্থির ধ্যানের ব্যাপার, চিন্তার মুখোমুখি হওয়ার ব্যাপার, সেসব ক্রমশ উধাও হচ্ছে, এরইমধ্যে আমি একটা বেশ উঁচুমানের রিডিং গ্রুপে কঠিন কঠিন টেক্সট পড়তে ঢুকে দেখেছি, তাঁদের প্রথম ও প্রধান বিবেচ্য হয়েছে চিন্তার জটটা ধরতে বা খুলতে পারছি কি না, মূল ভাষা শিখে আয়ত্ত করতে পারছি কি না, প্রস্তুতি ও পরিশ্রমে খামতি পড়লেই আমি চাঁটি খেয়ে যাচ্ছি, বাদ পড়ে যাচ্ছি গ্রুপ থেকে, এখানে বিশেষ করে ভাবার আছে কিন্তু, আমি প্রায় খুঁজেই পায়নি মফস্বলের বিদ্যায়তনিক পরিসরের এমন কাউকে, যিনি নিবিড়ভাবে এইসব কোর টেক্সট পড়ছেন, আর সেই জটিল চিন্তার ধারাপাত আলোচনার মধ্যে দিয়ে ছড়িয়ে দিচ্ছেন ক্লাসে, ছাত্ররা তপ্ত হয়ে উঠছে, কোথায় সেসব! চাই সেইরকম পরিশ্রম, মাথা খাটানো, আন্তর্জাতিক চিন্তার পরিসরে প্রবেশের সামর্থ্য, গায়ে হাওয়া লাগিয়ে ইংরেজি শেখা কিংবা শুয়ে বসে কবিতা উপন্যাস পড়ে ক্লাসে হ্যাজানো নয়, পড়াশুনোর মানচিত্র বদলে গেছে, আজকেই মাধ্যমিকের রেজাল্টস্ বেরোল, তৃতীয় হয়েছে নৈঋত, সে সাহিত্য পড়তে ভালোবাসে, প্রিয় লেখক কে? উত্তর শরৎচন্দ্র, বাংলা মিডিয়াম, ভালো স্কুল, ভাবতে হবে, ভাবতে হবে। গ্রাম মফস্বলের শিক্ষকদের সেই লেভেলে পড়াশুনো করে ছাত্রদের পেছনে লাগতে হবে, তৈরি করতে হবে ছাত্র, সত্যিকারের পড়াশুনো কোথায় পৌঁছেছে সেটা ভাবার প্রয়োজন আছে, নইলে হিউম্যানিটিজ-এর স্পেস ডিফারেন্সকে প্রশ্ন করা যাবে না, স্পেস-এর হায়ারার্কিকে ঝটকে দেওয়া যাবে না, ভেতর থেকে তাকে ঝটকাতে হবে, খুব খুব "কঠিন" কাজ, পরিশ্রমের, নিষ্ঠার, নিজেকে প্রস্তুত করতে হবে, নইলে ঠাট বাট ভাব দেখিয়ে উচ্চসাংস্কৃতিক পরিবেশপুষ্ট নাগরিক (বুদ্ধিমান) ছেলেমেয়েরা চিরকাল সব ক্ষেত্রে এগিয়ে থাকবে, হ্যাঁ, আমি স্পেস নিয়ে কথা বলছি, যত গ্রামের দিকে যাবেন, তত করুণ করুণতর অবস্থা, শ্রেণি, লিঙ্গ, জাতি নিয়ে আমরা লড়ছি, সংঘবদ্ধ হচ্ছি, কিন্তু পরিসরের পলিটিক্স নিয়ে ভাবা দরকার, বিশেষ করে হিউম্যানিটিজ, ইংরেজি ভাষা সাহিত্যের চর্চায়। আসুন, চিন্তায় আক্রান্ত হই আমরা, হিউম্যানিটিজ বিয়ন্ড ডিসিপ্লিনের ভাবনাটিকে বোঝার চেষ্টা করি, ধাক্কা খাই, আমদের ছেলেমেয়েদের অংকে একশোয় একশো পাওয়াটা কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বের, এমনি এমনি বলছি না। কথা হোক। আর হ্যাঁ, ওই ইটটা কিন্তু ছুঁড়ে মারতেই হবে, ইট হয়ে যাওয়া মাথা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই। নৈঋতদের শরৎচন্দ্রে আটকে গেলে হবে না, পড়তে হবে দেশ বিদেশের সাহিত্য, জটিল তত্ত্ব, তর্ক, রাজনৈতিক দর্শন, "কঠিন" বলছি না কিন্তু, ওসব সুখী মানুষেরা বলেন, যাঁদের গভীরতা নেই, ব্যাপ্তি নেই, খাটার ফুরসৎ নেই, যাঁদের চিন্তার সামনে দাঁড়িয়ে আপনি কখনোই থ হয়ে যান না, নিজেদের প্রস্তুত করার এই সময়, আকালেই বোধনের সময়। ওই দেখুন এসব ভাবতে ভাবতে হাঁটতে হাঁটতে একটা টোটো বেরিয়ে গেল সামনে দিয়ে, চিৎকার করলাম, ব্যাটা তারু কানেই শুনল না, বেরিয়ে পড়েছি, আজকে ছেলেমেয়েদের পড়াব গ্রামশির চিন্তায় সমাজে বুদ্ধিজীবীর ভূমিকা, রোদ খাইখাই করছে, হাওয়া পুড়িয়ে দিচ্ছে চামড়া।

আমার, কলেজে দেখা, এক বিরল প্রতিভা

জ্যোতির্ময় গুহ (সহযোগী অধ্যাপক, পদার্থবিদ্যা বিভাগ)

কানা বেগুন আনতে হবে, তবে বেশি কানা হলে হবে না- বউয়ের এই কঠোর আদেশ শিরোধার্য করে বাজারে গিয়ে এক সবজিওয়ালাকে ব্যাপারটা ভালভাবে বোঝালাম। সে আমায় এই বাছাবাছির ধরনটি পরিষ্কার করে হাতে-কলমে দেখিয়ে দিল।কয়েকটা বেগুন বেছে আলাদা করার পর হঠাৎই, আমার ফোন বেজে উঠল। স্ক্রিনে ভেসে উঠল: পায়েল গুচ্ছায়িত। ফোনটা ধরলাম।

"হ্যালো স্যার! আপনি কি আমাকে চিনতে পারছেন?"-একটা আকর্ষণীয় কণ্ঠ, অস্বাভাবিক মিষ্টি। প্রলুব্ধকর স্বর, বিপজ্জনকভাবে ভদ্র।

আমি একটু থামলাম। শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা আমাকে শিখিয়েছে-এমন মিষ্টতা সাধারণত কোনো শিক্ষাগত বিপদের ইঙ্গিত।

"কে বলছ?" আমার সতর্ক মার্জিত জিজ্ঞাসা।

"স্যার! চিনতে পারছেন না?", একটু থেমে, আরও মোলায়েমভাবে, "স্যার আমি বলছি, ... স্যার পায়েল... আপনার ছাত্রী।"

"বলো"

"স্যার, আপনি ভালো আছেন তো?"

হঠাৎ এক জন ছাত্রীর আমার ব্যাপারে এত উদ্বেগ, দিল্ থেকে উৎসারিত এত দরদ! বুকের পাঁজরে একটু সতর্কতামূলক কাঁপুনি অনুভব করলাম।

"হ্যাঁ... কিন্তু কেন ফোন করছ?"

"স্যার, একটা উপকার করবেন?"

বুঝতে পারছিলাম না, কি বলব। হ্যাঁ বললেও বিপদ, না বললেও। কোনটা বলা শ্রেয় ভাবতে ভাবতে ওর সুললিত কণ্ঠস্বর আবারও ধ্বনিত হল।

"স্যার ... পুরোপুরি একাডেমিক ব্যাপার।"

আমি ভাবলাম, কী জ্বালা। ও কি ভাবছিল যে আমি অন্য রকম কিছু আশা করছি! কি জানি? স্ট্রেট ব্যাটে খেলা শুরু করাই শ্রেয় বলে মনে করলাম। একটু রূঢ়ভাবে বলবার চেষ্টা করলাম;

"বল.... কি ... ব্যাপারটা কি?"

"স্যার... আমি খুব সমস্যায় পড়েছি।"

"কি হয়েছে?"

"স্যার একাডেমিক সমস্যা স্যার।"

এবার যথেষ্ট বিরক্ত হলাম।

"আমি এখন বাজারে আছি, আর আজ আমার ইনভিজিলেশন ডিউটি আছে। প্রথম সেমিস্টারের পরীক্ষা শুরু। যদি কিছু বলার থাকে সরাসরি বলো। আমার সময় কম।"

"হ্যাঁ স্যার। আমিও আজ পরীক্ষা দিতে যাচ্ছি। সেই কারণেই আপনাকে ফোন করেছি।"

"হ্যাঁ........?"

"স্যার... আমি গত মাসে আপনাকে একটা প্রজেক্ট জমা দিয়েছিলাম।"

"আচ্ছা ..."

"তা... স্যার... সেটা কোন বিষয়ের ছিল স্যার?" প্রাণচঞ্চল কণ্ঠে অবলীলাক্রমে সে বলে ফেলল। এতটা স্মার্ট, আত্মবিশ্বাসী প্রশ্ন আমি আশা করিনি। এবার মনে হলো আমার উত্তর শোনার জন্য ও ভীষণ ব্যাকুল।

আমি একটু থমকে গেলাম। ততক্ষণে, আমার বাছাই করা বেগুনগুলো, সবজিওয়ালা, তার আরেকজন বাঁধা খরিদ্দারকে সস্নেহে বেচে দিয়েছে। এবং তার পরেই আমার দিকে আড়চোখে তাকিয়ে, তার দুই ইঞ্চি লম্বা লাল জিভ লেফট-রাইট প্যারেড করিয়ে, স্বাভাবিক অবস্থানে নিয়ে গেছে- যেন কিছুই হয়নি।

"কি বললে?"

"স্যার, আজ আমাদের তো প্রথম সেমিস্টারের পরীক্ষা... আর আমি প্রজেক্টটা যে বিষয়ে জমা দিয়েছি সেই বিষয়েই তো পরীক্ষা দিতে হবে.. মানে... অ্যাজ পার রুল। তাই... স্যার... একটু জানতে চাচ্ছিলাম!" মেয়েটির আর্তি-ঝরা কণ্ঠ আমাকে বিচলিত করল, কিন্তু তার আর্জি আমাকে বিস্মিত করল।।

"মানে... তুমি প্রজেক্ট জমা দিয়েছ... আর জানো না সেটা কোন বিষয়ের?"

"স্যার ঠিক মনে নেই," সততা ও সরলতা তার কণ্ঠ বেয়ে যেন উপচে পড়ছিল ফোয়ারার মতো।

সবজিওয়ালা ততক্ষণে নিজেই, ভিড় হওয়া সত্ত্বেও, আমার জন্য বেগুন পুনর্নির্বাচন করে ফেলেছে। (খেয়াল হল যে বেগুন নির্বাচনে তো (জ্জট্ট এর ঝামেলা নেই)

"তুমি একা জমা দিয়েছিলে?"

"না স্যার। মনীষা আর দীপশিতা আমার সঙ্গে ছিল।"

"তাহলে ওদের জিজ্ঞেস করো! তুমি কোন বিষয়ে নির্বাচন করেছ তা আমার বলাটা ঠিক নয়। তাও আবার ফোনের মাধ্যমে। তাছাড়া তোমাকে তো আমি ঠিক চিনলামই না। বলব কীভাবে..."

"স্যার, মনীষা বলছে প্রজেক্টে একটা লম্বা রেখা, ওপর থেকে নিচের দিকে, অনেকটা নদীর বাঁকের মতো আঁকতে হয়েছিল, তাই ওটা ভূগোলের প্রজেক্ট হবে। কিন্তু স্যার, বিদিশা মেয়েটা ঝামেলা লাগিয়ে দিয়েছে। বলছে নিচে একটা সমান চিহ্নও আমরা লিখেছিলাম, তাই ওটা গণিত হবে স্যার।" মেয়েটির নির্বিকার ভাব এবং স্পষ্ট বাচনভঙ্গি আমাকে অবাক করল ,

"স্যার, আপনি তো আমাদের বিষয়ের নাম বলেননি। শুধু কী লিখতে হবে আর কীভাবে প্রজেক্ট বানাতে হবে, সেটাই বলেছিলেন!"

আমি চুপ করে গেলাম। হয়তো সত্যিই আমারই কোথাও দোষ ছিল। নাহলে পদার্থবিদ্যা নিশ্চয়ই এমনভাবে পড়িয়েছি, যে কারও কাছে সেটা ভূগোল বলে মনে হয়েছে, আবার কারও কাছে সেটা গণিত বলে মনে হয়েছে। কি উত্তর দেবো তা ভাবতে ভাবতেই মেয়েটি বলল-

"স্যার, আমার মনে হচ্ছে মনীষাই ঠিক বলছে। ওটা ভূগোলই হবে।"

আমার রক্তচাপ এখনো নেই, তবে এই ফোনালাপ যে সেটি হওয়ার পথ সুগম করছে তা বিলকুল বুঝলাম। আমাদের কলেজে তো এখনো ভূগোল বিষয় চালুই হয়নি।

হঠাৎ ফোন কেটে গেল-বা হতে পারে মেয়েটি আমার ওপর তার এই অযাচিত এবং আকস্মিক মায়াজাল বিস্তারের মাধ্যমে নিজেই নিজের প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যাওয়াতে ফোন কেটে দিল। ভাগ্যিস!পদার্থবিদ্যার যে প্রজেক্টটি করতে দিয়েছিলাম, তার কয়েকটি সমীকরণ আমার মাথায়, বিচিত্রভাবে উঠানামা করতে লাগল, আর প্রদত্ত

লেখচিত্রটি মনে হলো নদীর জলে আছাড় খেয়ে পড়ে গিয়ে, ঢেউয়ের সাথে ভাসতে ভাসতে, সমস্ত ভৌগোলিক সীমা অতিক্রম করে ছুটে পালাচ্ছে।

কলেজে পৌঁছে আমি ১১ নম্বর ঘরে ইনভিজিলেশনে বসলাম।

পরীক্ষার প্রায় শেষের দিকে, একটি মেয়ে এসে খাতা জমা দিল। আত্মবিশ্বাসে উজ্জ্বল।

''স্যার... আমি পায়েল,'' তার মায়াবী কণ্ঠস্বর সকালের কথা মনে করিয়ে দিল।

''সকালে আপনাকে ফোন করেছিলাম স্যার।''

আমি তার দিকে তাকালাম-কৌতূহল আর আগ্রহ নিয়ে।

''হ্যাঁ। পরীক্ষা কেমন হল?'' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

''খুব ভালো স্যার। প্রশ্নগুলো সহজ ছিল।''

মনে স্বস্তির স্রোত বইল। তবে বেশি কথা বাড়ানোর প্রয়োজন বোধ করলাম না।

.......কী জানি কেন... মনে হতে লাগল ও সঠিক বিষয় জেনে পরীক্ষা দিয়েছে তো...

.....ওর খাতাটা একটু উল্টে দেখলাম........

রসায়নের উত্তরপত্র....

নীরব ব্যাখ্যাহীন অবস্থায় রইলাম হয়তো বা দুই পলক।

ক্ষণিকের জন্য মনে হল ঈশ্বর বোধহয় আমাকে একটু বেশিই কৃপা করে ফেলেছেন। প্রতিভার এত বিচ্ছুরণ না থাকা সত্ত্বেও শান্তিপুর কলেজে শিক্ষক হিসেবে কাজ করছি... তাও আবার এতদিন ধরে.......

অন্যমনস্ক মন আমার ঈশ্বর অবধি চলে গিয়েছিল। তাকে আবার টেনে হিঁচড়ে ইহলোকে ফেরাতে গিয়েই আবার চোখে পড়ল সেই লাস্যময়ী ললনার ওপর।

হলের বাইরে সে তার অবিন্যস্ত চুল পরিপাটি করছে, মনে যুদ্ধজয়ের উন্মাদনা, তার ভঙ্গিতে ছিল এক অজানা মায়া। হঠাৎ বক্ষ বিভাজিকায় হালকা কম্পন-দূর থেকে মনে হল কোনো গোপন ইশারা এসে পৌঁছেছে সে চঞ্চল হয়ে উঠল। তাড়াতাড়ি করে নিজের নিরাপদ আশ্রয় থেকে সে টেনে বের করল তার সযত্নে রাখা সুরক্ষাকবচটি। উদ্বিগ্ন প্রেমিককে ফিসফিস করে আশ্বস্ত করল, ''জানো তো তন্ময়, ঘরের স্যার-ম্যাডামগুলো না ... খুউব ভালো ছিল। পরীক্ষা ভালো হয়েছে। এখন বেশি কথা বললে স্যারেরা খারাপ ভাববে। পরে ফোন করছি। কেমন?''

পঞ্চম দোল

শ্রীবাস দেবনাথ (সহকারী অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ)

বসুদেব ও দেবকীর অষ্টম পুত্র এবং নন্দরাজ ও যশোদার দ্বারা পালিত শিশু কৃষ্ণকে হত্যা করতে মথুরার রাজা কৃষ্ণের মাতুল কংস পুতনা রাক্ষসীকে নন্দালয়ে প্রেরণ করেন। পুতনা তার স্তনে বিষ মিশিয়ে দেয়। ফলে পুতনার বিষলিপ্ত স্তনদুগ্ধ পান করে গোকুলের কয়েকটি শিশু মারা যায়। কিন্তু কৃষ্ণ পুতনার দুগ্ধপান করে তাকে বধ করেন। এদিকে পুতনার বিষময় দুগ্ধ পান করে বিষক্রিয়ার ফলে কৃষ্ণের শরীর শ্যামবর্ণ ধারণ করে। বড় হয়ে কৃষ্ণ যখন মা যশোদার নিকট তার নিজের শ্যামবর্ণের জন্য অনুযোগ করে এবং রাধার গৌরবর্ণের জন্য অভিযোগ করে, তখন মা যশোদা তাকে বলেন যে রাধার উজ্জ্বল বদনে রং মাখিয়ে দিতে। কৃষ্ণ তখন তাই করে। এই প্রীতিমধুর ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাধাকৃষ্ণের দোলোৎসব এবং রংখেলার সূত্রপাত। এরকম কেউ কেউ মনে করেন। এই উৎসবে রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ দোলনায় রেখে দোলানোর জন্য এর নাম দোল।দোলের প্রকারভেদ -- রাধাকৃষ্ণের ভাবধারা আমাদের দেশের যেখানে যেখানে প্রসারিত সেই সকল স্থানে ফাল্গুন মাসের পূর্ণিমা তিথিতে দোল হয়। বাংলায় রংখেলা সেই তিথিতে হয়। কিন্তু উত্তর ভারতে হোলি উৎসব পরের দিন হয়। নদীয়ায় এই দোলের নানা প্রকারভেদ আছে। নদীয়ার আধ্যাত্মিক প্রাণকেন্দ্র হল শ্রীচৈতন্যের পদধূলি ধন্য নবদ্বীপ ও শান্তিপুর। এই দুই শহরের বিভিন্ন মন্দিরে প্রথম দিন দোল অনুষ্ঠিত হয়। তবুও এক এক মন্দির এক এক বিশেষ দোলের জন্য প্রসিদ্ধ। যেমন শান্তিপুর শহরের দোলের চিত্রটি এরকম--প্রথম দোল--বড় গোস্বামী বাড়ি;দ্বিতীয় দোল-- বড়বাজারের শ্যামচাঁদ মন্দির;তৃতীয় দোল-- দীনদয়াল ঠাকুর বাড়ি (গোভাগাড় মোড়ের কাছে);চতুর্থ দোল -- দিল্লী বাড়ি; পঞ্চম দোল -- ১. পুঁটো পুঁটি জীউ (ষষ্ঠী তলা), ২. সাহা বাড়ি(গোপালপুর), ৩. শ্রী গোপীনাথ জ্যাঠা জীউ মন্দির; ষষ্ঠ দোল-- সিদ্ধেশ্বরী কালীবাড়ি;সপ্তম দোল -- অদ্বৈত মহাপ্রভু (বাবলা, গোবিন্দপুর), শান্তিপুর পাবলিক লাইব্রেরীর নিকটবর্তী চাকফেরা গোস্বামী বাড়ি (কাশ্যপ পাড়ার মোড়) এবং মুন্সিপাড়া;অষ্টম দোল- লক্ষ্মীতলা পাড়ার শীতলামাতার মন্দির;নবম দোল - ফুলিয়ায় বাংলাভাষায় রামায়ণ রচনাকারী কবি কৃত্তিবাসের বাড়ি।এই দোলগুলি পরপর তিথি অনুযায়ী অনুষ্ঠিত হয়। দশম ও একাদশ দোল হয় না। দ্বাদশ দোল নদীয়ার সদর শহর কৃষ্ণনগরের কৃষ্ণচন্দ্র রাজার রাজবাড়িতে হয়। এখানে এই উপলক্ষ্যে এক মহতী মেলার আয়োজন হয়। তবে অগ্রদ্বীপ প্রভৃতি বার জায়গার রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ সাদরে এনে এখানে পূজার আয়োজন করা হয় বলে একে বলে বার দোলের মেলা। কোনো স্থান থেকে নানা কারণে বিগ্রহ না আনতে পারলে তৎসদৃশ মূর্তি নির্মাণ করা হয়।এখন প্রথম দোলের পর পঞ্চম দিনে অনুষ্ঠিত পঞ্চম দোল ও তার মন্দিরগুলি নিয়ে আলোচনা করা যাক।১. শ্রী শ্রী পুঁটো পুঁটি জীউ মন্দির, শান্তিপুর- এই নয়নাভিরাম মন্দিরটি নবরূপে স্থাপিত হয় ১৯৮৯ খ্রীষ্টাব্দে। শান্তিপুর কলেজের পশ্চিমে সরকারী গার্ডেনের সম্মুখভাগ দিয়ে দক্ষিণে একটু গেলেই দুটি রাস্তার সংযোগস্থলে এই মন্দিরটি দৃষ্টিগোচর হয়। এখানে দক্ষিণমুখী পাশাপাশি যজ্ঞেশ্বর শিব মন্দির, রাসকালী মন্দির, রাধাকৃষ্ণ মন্দির এবং কিছুটা দক্ষিণে পূর্বমুখী ধেড়ে (বেশি বয়সী) গোপালের মন্দির অবস্থিত। রাধাকৃষ্ণের মন্দিরটি শ্রী শ্রী পুঁটো পুঁটি জীউ মন্দির নামে চিহ্নিত। বেশ কয়েক দশক পূর্বে পুঁটো-পুঁটি নামে দুজন দম্পতি ছিলেন। তাঁরা ছিলেন নিঃসন্তান। তাঁদের গৃহে রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহের নিত্য সেবা হত। সেই বিগ্রহদুটি এখন এই মন্দিরে পূজিত হয়। প্রথম দোলের পর পঞ্চমী তিথিতে এখানে মহাসমারোহে পঞ্চম দোল অনুষ্ঠিত হয়। এই দিন মূল বেদি থেকে রাধাকৃষ্ণের যুগল বিগ্রহ রাসকালী মন্দিরের সামনে রেখে পূজা করা হয়। ভোগ হিসেবে ফলাদির সঙ্গে খেচরান্ন ও পায়সান্ন নিবেদন করা

হয়। রং খেলে ভক্তরা পরিবেশটিকে করেন আনন্দমুখরিত। মন্দির কমিটি JPRS Foundation গঠন করেছে। এক্ষেত্রে J=যজ্ঞেশ্বর, P=পুঁটো পুঁটি, R=রাসকালী, S=ষষ্ঠীতলা। এই সংগঠনের একটি ambulance আছে।২. শ্রী শ্রী জ্যাঠা গোপীনাথ জীউ মন্দির, শান্তিপুর - এই দক্ষিণমুখী মন্দিরটি গোপালপুরের দক্ষিণে অবস্থিত। মন্দিরের বৃহৎ পরিসরটি দান করেন সাহিত্যিক দামোদর মুখোপাধ্যায়ের তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী মৃণালিনী দেবী। শান্তিপুরের সকল কৃষ্ণবিগ্রহের মধ্যে এই মন্দিরের শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহটি আকারে জ্যেষ্ঠ। এই কারণে এর নাম জ্যাঠা গোপীনাথ জীউ। জীউ শব্দের অর্থ হল জীব। পঞ্চম দোলের দিন রাধাকৃষ্ণের যুগল বিগ্রহ মন্দিরের সামনে এনে পূজা করা হয়। রং খেলা হয় শালীনতা বজায় রেখে। এই দিন মন্দিরের সামনে ও পিছনে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সুবৃহৎ প্রাঙ্গণে বড় মেলা বসে। এই মন্দিরসংলগ্ন এলাকাটি আর্থিকভাবে পশ্চাদ্বর্তী হওয়ায় মন্দিরে ভোগরাগাদির বিষয়ে বেশি আড়ম্বর করা হয় না।৩. সাহা বাড়ির রাধারমণ মন্দির, গোপালপুর, শান্তিপুর- এর প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গীয় শ্রী কুঞ্জবিহারী সাহা। পশ্চিমমুখী মন্দিরে বেদির তিনটি ধাপে শ্রীবিগ্রহসমূহ শোভমান। উপরের ধাপে রাধাকৃষ্ণ এবং রঘুনাথ রামের বিগ্রহ, মাঝের ধাপে গড়ুর, গৌরনিতাই, জগন্নাথের বিগ্রহ ও নারায়ণের শালগ্রামশিলা বিদ্যমান। নীচের ধাপে গণেশ ও লক্ষ্মীদেবী বিরাজমান। বিগ্রহসমূহ নিত্য পূজিত হন। পঞ্চম দোলের দিন মূল বেদির বাঁদিকে রাখা সুদৃশ্য হাওদাতে রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ স্থাপন করা হয় এবং সেখানেই রাধাকৃষ্ণ পূজিত হন। ভক্তরা মন্দিরের দ্বিতীয় দরজা দিয়ে অর্থাৎ বাঁপাশের দরজা দিয়ে রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ দর্শন করেন। নগরপরিক্রমণের জন্য বিগ্রহকে বা দেবীরূপে সজ্জিতা কুমারী নারীকে চাকাযুক্ত যে বাহনে রাখা হয় তাকে বলা হয় হাওদা। মন্দিরের সামনে সুবৃহৎ নাটমন্দিরে ভক্তরা রং খেলেন পঞ্চম দোলের দিন। মন্দিরটি সাহা পরিবারের হলেও প্রতিবেশীরা পঞ্চম দোল প্রভৃতি উৎসবে নিমন্ত্রিত হন।৪. শ্রীবাস-অঙ্গন, নবদ্বীপ - নবদ্বীপে শ্রীবাস-অঙ্গনে পঞ্চম দোল অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীবাসের এই যোগপীঠে নিমাই হরিনাম সংকীর্তন করতেন। এই মন্দিরে রাধাকৃষ্ণ, রাসলীলার গোপীবৃন্দ, গৌরনিতাই, নিত্যানন্দের দুই স্ত্রী বসুধাদেবী ও জাহ্নবীদেবী, জগন্নাথ, প্রতাপরুদ্র, বাসুদেব সার্বভৌম প্রভৃতির বিগ্রহসমূহ এবং অনেকগুলি শালগ্রামশিলা নিত্য পূজিত হন। পঞ্চম দোলের দিন গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর বিগ্রহ নিয়ে নবদ্বীপ শহরে পরিক্রমা করা হয়। এই মন্দিরে উৎসব চার পাঁচ দিন ধরে চলে। সামনের নাটমন্দিরে এই সময় হরিনাম সংকীর্তন ও শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণ পাঠ করা হয়। দূরদূরান্ত থেকে অগণিত ভক্তরা এসে এই মন্দিরের চত্বরটিকে মুখরিত করে তোলেন। এইভাবে পঞ্চম দোল সকল প্রকার দোলের মধ্যে আপন বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল।

পুতুল

অনির্বাণ বিশ্বাস (শিক্ষাকর্মী)

পানাফুলের মতো সফেদ নীলাভ দুটি চোখ। আদর-সোহাগ জড়ানো আধো আধো কথা সব। অতি শাসনে দুহাত জড়িয়ে ধরে। বাবা কোথায় থাকে?

আর একটা বিয়ে করে দিল্লী চলে গ্যাছে। সফেদ নীলাভ দুটি চোখের পাতায় এই শীতের বিকেলে একটু একটু ঘাম জমতে শুরু করেছে।

আষাঢ়ের শান্ত স্নিগ্ধতার ঝড় দেখেছো... বন্ধু?

পুতুলের সমস্ত মুখ মন্ডল জুড়ে আমি সেই ঝড় বয়ে যেতে দেখেছি।

সেই মেয়েটি

সঞ্জয় দেবনাথ (শিক্ষক, ইংরেজি বিভাগ)

তাকে ছাড়া কোন কবিতা, আসেনা ভাবনায়,
নিষেধের সীমানা ছাড়ায়, আবদ্ধ মন জানালায়।
দুটি চোখ তাকেই খুঁজে বেড়ায়।
দু'পা হেঁটে, শহর থেকে অনতিদূরে
চেনা অথচ অচেনা পাড়াগাঁতে, মেয়েটি থাকে।
সেথা তার আবাস গৃহ-
সেও বলেনি, প্রয়োজন পড়েনি,
যাওয়াও হয়নি কখনো আর,
তবু তাকে খুঁজি বারবার।
দিশাহারা, একলা পথিক আনমনা,
চলেছি পথ ধরে ছন্নছাড়া।
অন্ধকার নামে, ট্রেন থামে, কোলাহল বাড়ে,
হঠাৎ সম্বিত ফেরে চেনা ডাকে -
"দাদা, দা..দা..আমি এদিকে"।
ধাবমান টোটো থেকে, ঝুঁকে, বাহু তুলে
উঁকি দেয় সেটি চেনা মুখ,
নিতান্ত সাধারণ মেয়ে-
সরল হাসিতে হাত নাড়ে।
গাড়ি ত্বরিতগতি হয়,
সে বিদায় জানায়, হাতের ইশারায়,
দৃশ্যটা রয়ে যায়।
তারপর অনেক খুঁজেছি তাকে -স্টেশন চত্বরে, রাস্তাঘাটে, দোকানে, বাজারে
কোথাও সে নাই!
অনেক দিন পর, তার সাথে দেখা হলো আবার।
সেই পরিচিত কণ্ঠস্বর, ভীষণ আপনার
খুশিতে জানালো তার নতুন উপহার। ঘুম ভাঙে, হায়! দেখা নাই...
অজস্র ভিড়ের মাঝে, মন তাকে, খুঁজে বেড়ায়
ভালোবাসা হারায়-
মেয়েটির খোঁজ নাই।

স্কুটি পাশ কাটায়,
কথা নাই.. উপেক্ষায়!
যেদিকে তাকায়, বড্ড শহুরে মনে হয়,
গ্রামটুকু আর নাই।
আধুনিকতায়, অসহায় মেয়েটি লুকায়,
কৃত্রিমতায় লাবণ্য হারায়, দেখা নাহি পাই।
পাগল কলম তবুও লিখে যায় ...